এম.ফিল্.থিসিস

এনজিও কর্ম এলাকার দারিদ্র্য বিমোচন ঃ দুটো নমুনার আলোকে

382770

তত্ত্বাবধায়ক ঃ

মোঃ ফেরদৌস হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

GIFT

গবেষক ঃ

মোহাম্মদ মোর্শেদ
রেজিঃ নং ঃ ২০৩
শিক্ষাবর্ষ ১৯৯৪-৯৫
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

UNIVERSITY OF DHAKA
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, মোহাম্মদ মোর্শেদ (রেজিঃ নং ২০৩, শিক্ষাবর্ষ ১৯৯৪-৯৫, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) বিরচিত **"এনজিও কর্ম এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচন ঃ দুটো নমুনার আলোকে"** শীর্ষক এম.ফিল অভিসন্দর্ভ একটি মৌলিক গবেষণা-কর্ম। এই রচনাটি কিংবা এর অংশ বিশেষ অন্য কোথাও প্রকাশিত হয়নি বা প্রকাশের জন্য জমা দেয়া হয়নি।

উক্ত অভিসন্দর্ভটি আমি যথাযথ পরীক্ষা করেছি এবং এর গুণগত মান এম.ফিল ডিগ্রীর উপযুক্ত বলে বিবেচনা করছি।

M.Phil.
382770

তারিখ ঃ ২২ ডিসেম্বর ১৯৯৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

(মোঃ ফেরদৌস হোসেন)
সহযোগী অধ্যাপক

RB
B
330.9
MOA
C-1
DULAP
Dhaka University Library
382770

Arts Building
Dhaka-1000, Bangladesh
Tel : PABX 9661900-59, Extn. 4460
Fax : 880-2-865583, E-mail : duregstr@bangla.net

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

১।	ভূমিকা		০১
২।	গবেষণায় প্রয়োজনীয়তা		০৩
৩।	গবেষণা পদ্ধতি		০৩
৪।	গবেষণা এলাকার বিবরণ		০৫
৫।	বিষয় বিশ্লেষণ		
	ক)	আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্যের ধারণা বিশ্লেষণ	০৭
	খ)	দারিদ্র্য ঃ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট	০৭
	গ)	দারিদ্র্য ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত	০৮
	ঘ)	দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল	১০
	ঙ)	দারিদ্র্য বিমোচনে বেসরকারী উদ্যোগ	১৪
৬।	ক)	আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে এনজিও'র ধারাবাহিক বিকাশ	১৬
	খ)	বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রম	১৮
৭।	নমুনা বিশ্লেষণ		
	ক)	আশা - সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	১৯
	খ)	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে আশা'র কার্যক্রম	২৬
	গ)	ফুলগাজী এলাকায় দারিদ্র্য পরিস্থিতি ও আশা'র কার্যক্রম	৩১
৮।	ক)	মৌচাক - সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	৩৯
	খ)	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে মৌচাকের উন্নয়ন কার্যক্রম	৪২
	গ)	মৌচাক এর কার্যক্রমের ফলে জীবনধারনের বিভিন্নক্ষেত্রে পরিবর্তন ও অগ্রগতির চিত্র	৪৭
	ঘ)	দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টায় আশা ও মৌচাকের সীমাবদ্ধতা ও সাফল্যের তুলনামূলক বিশ্লেষন	৪৯
	উপসংহার		৫১
	পরিশিষ্ট		৫৭
	সহায়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ		৬০

382770

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

এনজিও কর্মএলাকায় দারিদ্র্য বিমোচন ঃ দুটো নমুনার আলোকে

ভূমিকা

বাংলাদেশের জনগণের ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিশ্বব্যাপী পরিচিত। বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ও খরার মতো ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এ দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে বার বার ব্যাহত করেছে। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি, আমদানী-নির্ভর বাণিজ্য ব্যবস্থা, শিল্পক্ষেত্রে নিম্নমানের উৎপাদনশীলতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সর্বোপরি মানব সম্পদ উন্নয়নে ব্যর্থতা ইত্যাদি কারনে বাংলাদেশ দারিদ্র্যের শিকলমুক্ত হতে পারেনি।[১] বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দারিদ্র্য ঘুচাতে আয়ের প্রবৃদ্ধির হার ৫% এর অধিক করতে বিশ্বব্যাংক পরামর্শ দিয়েছে, অপর পক্ষে গত দু'দশকে বাংলাদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় বেড়েছে ১.৬% হারে।[১]

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ১৯৯৮ সালের সমীক্ষানুযায়ী, বর্তমানে গ্রামীণ জনসংখ্যার ৪৮% দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করছে। ইউএনডিপি'র মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন '৯৮তে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ২৯ মিলিয়ন শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। নারীর আয় এক চতুর্থাংশ। পুরুষের তুলনায় একজন নারী ১২% কম পুষ্টি গ্রহণ করে। মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে ১৭৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের স্থান ১৪৪তম।[২]

382770

সমাজ উন্নয়নের ইতিহাসে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নয়ন প্রচেষ্টা কোন নতুন বিষয় নয়। বিশেষতঃ বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা খুবই স্বাভাবিক।

প্রচলিত অর্থে 'দরিদ্র' বলতে বুঝায় সেসব জনসমষ্টিকে যারা ক্রমাগত অনাহার, অর্ধাহার ও অপুষ্টির শিকার, যারা অশিক্ষিত, যাদের জীবনে অন্ন বস্ত্রের নিশ্চয়তা অনুপস্থিত এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয়ে যারা অক্ষম।

দরিদ্রতা উন্নয়নের অন্তরায়। তাই কোন দেশ বা জাতির জীবনে এই অভিশাপের উপস্থিতি কাম্য নয়। ফলে যে কোন সভ্য সমাজে দারিদ্র্য নিরসনে নানাবিধ প্রচেষ্টা লক্ষনীয়।

একটি দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের একক উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। তাই বেসরকারী পর্যায়ে উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। সভ্যতার উষালগ্ন থেকে মানব সমাজে রাষ্ট্রীয় প্রয়াস ও উদ্যোগে মানুষের প্রয়োজন ও সমস্যা মোকাবেলার পাশাপাশি আকস্মিকভাবে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের লক্ষে স্থানীয় জনগণ নিজস্ব উদ্যোগে নিজ নিজ এলাকার সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহন করে। এভাবে আবহমান কাল থেকে বিভিন্ন সমাজে আর্তের সেবায় বা মানব কল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মহতী প্রয়াসের প্রাতিষ্ঠানিক ও সুসংগঠিত রূপ হচ্ছে বেসরকারী সংস্থা বা এনজিও।

---

[১] রুশিদান ইসলাম রহমান, দারিদ্র্য ও উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, বিআইডিএস, ১৯৯৭,ঢাকা।

[২] UNDP, মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, ১৯৯৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষে কয়েকটি বেসরকারী সংস্থা দেশের বিভিন্ন এলাকায় উন্নয়ন প্রচেষ্টা শুরু করে এবং প্রাথমিক সাফল্যের পর এসব এনজিও'র কর্মএলাকায় পরিসর ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। আবার পাশাপাশি নতুন এনজিও'র আত্মপ্রকাশ অব্যাহত থাকে।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে কর্মরত এনজিও সমূহের উদ্দেশ্য ও কর্ম প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রায় অভিন্নতা বিদ্যমান। গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কর্মরত এনজিওসমূহের সাধারণ কার্যক্রম হচ্ছে – জনগণের সচেতনতা সৃষ্টি, সমিতি গঠন, কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অতিরিক্ত আয়ের ব্যবস্থা করা, খাস জমি ও পুকুরের উপর আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং গ্রামীণ জনগণের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা। এসব কর্মসূচীর মাধ্যমে বিভিন্ন এনজিও দারিদ্র্য বিমোচনে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

'এনজিও কর্মএলাকায় দারিদ্র্য বিমোচন' এ বিষয়ে গবেষণা কাজ সম্পাদনের জন্য আমি Association For Social Advancement (ASA) এবং "মৌলিক চাহিদা কর্মসূচী (মৌচাক) নামক দু'টো এনজিওকে নমুনা হিসেবে বেছে নিয়েছি। এ গবেষণা কাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মৌচাকের নির্বাহী পরিচালক এ কে এম জাহাঙ্গীর আলম, আশা'র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ফয়জুর রহমান এবং সংস্থা দু'টোর মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা গবেষণা কাজে আমাকে দারুনভাবে অনুপ্রানিত করেছে। এছাড়া তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ক্রেডিট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম, এসোসিয়েশন অব ডেভেলপমেন্ট এজেন্সিস ইন বাংলাদেশ (এডাব), পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন, বিআইডিএস, স্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট এবং সেন্টার ফর ডেভলাপমেন্ট রিসার্চ ইন বাংলাদেশ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা পেয়েছি।

সর্বোপরি আমার এই গবেষণা কাজের তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ ফেরদৌস হোসেন এর সার্বিক নির্দেশনা, সহযোগিতা ও পরামর্শের কারণে গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। আমি তাঁর প্রতি সবিনয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশে গত দু'দশকেরও বেশী সময় বিভিন্ন এনজিও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। উন্নয়ন কর্মকান্ডে এনজিওসমূহের অংশগ্রহণ ও সাফল্যের বিষয়টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যেমন প্রশংসিত হয়েছে, ঠিক বিপরীতভাবে এনজিও কর্মকান্ড সমালোচনারও সম্মুখীন হয়েছে। সমালোচকরা এনজিওসমূহের দারিদ্র্য বিমোচন প্রয়াসকে 'উন্নয়ন ব্যবসা' নামে সমালোচনা করেছেন।

বাংলাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণের সাফল্য যখন বিশ্ব ক্ষুদ্র ঋণ সম্মেলনে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে ঠিক সে সময় দেশে সমালোচকরা ক্ষুদ্র ঋণের সমালোচনা করে এটিকে 'Banking on the poor' নামে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। অন্যদিকে দেশে দারিদ্র্য বিমোচন প্রক্রিয়ায় অগ্রগতিও সন্তোষজনক নয়।এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে এনজিওগুলো দারিদ্র্য বিমোচনে কতটুকু সফল হয়েছে তা গবেষণা করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

ক) এনজিও কর্মকান্ড দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হচ্ছে কিনা তা খুঁজে বের করা

খ) এনজিও কর্মকান্ডে জনগণের অংশগ্রহনের হার নির্ণয় করা

গ) দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণের কার্যকারিতা নির্ণয় করা

ঘ) কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে এনজিওগুলো কতটুকু সফল তা যাচাই করা

গবেষণা পদ্ধতি

'এনজিও কর্মএলাকায় দারিদ্র্য বিমোচন- দু'টো নমুনার আলোকে' শীর্ষক গবেষণা পরিকল্পনার পর উদ্দেশ্যমূলকভাবে বাংলাদেশে দীর্ঘদিন কর্মরত এনজিওগুলোর মধ্যে জাতীয় পর্যায়ের এনজিও 'আশা' এবং স্থানীয় এনজিও সমূহ থেকে 'মৌচাক'কে (মৌলিক চাহিদা কর্মসূচী) নমুনা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

মূলত: ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচীতে আশা'র সাফল্য এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আশা'র মডেল অনুসরণের কারণে 'আশা'কে এ ক্ষেত্রে উপযোগী নমুনা হিসাবে গণ্য করা হয়। এছাড়া আশা বর্তমানে বৈদেশিক সাহায্য ব্যতীত অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ থেকে ব্যয় নির্বাহ করায় এই এনজিওটিকে নমুনা হিসাবে গ্রহণ করা বেশী প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে।

এছাড়া মৌলিক চাহিদা কর্মসূচী (মৌচাক) খেটে খাওয়া মানুষের সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সকল পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে নারী - পুরুষের সুনিশ্চিত ও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের জন্য কর্মরত একটি বেসরকারী সংস্থা। প্রচার বিমুখ এই এনজিওটি ক্ষুদ্র ঋণের পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ কারনে এটিকে নমুনা হিসাবে বেছে নেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা কাজের প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি, বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বিআইডিএস এর প্রকাশিত প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন বিষয়মূলক রচনা হতে এ সংক্রান্ত তথ্য ও ধারনা সংগ্রহ করা হয়। এরপর সাধারণভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য মোকাবেলায় কর্মরত এনজিওসমূহের অবস্থান ও ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও রিপোর্ট অধ্যয়ন করা হয়। বিশেষতঃ 'আশা' প্রকাশিত বেশ কিছু মূল্যায়ন প্রতিবেদন, কেস ষ্টাডি, সংকলন এবং ক্ষুদ্র ঋণ বিষয়ক প্রকাশনাসমূহ অধ্যয়ন এবং সীমিত পর্যায়ের পর্যবেক্ষণের ফলে গবেষণার বিষয় সম্পর্কে ধারণা উন্নয়নের পর্যায় সমাপ্ত করা হয়।

ক্ষুদ্র ঋণদানের মাধ্যমে আশা'র কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিভিন্ন দিক অনুসন্ধান এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড দারিদ্র্য মোকাবেলায় কি প্রভাব রাখছে তা পরীক্ষা করার জন্য একটি এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং সেই এলাকা হতে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। অঞ্চলগত বৈশিষ্ট্য, জনসংখ্যা, দারিদ্র্য পরিস্থিতি, আশা'র সাথে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের অংশীদারিত্ব, জনগণের অংশগ্রহণের মাত্রা ইত্যাদি বিবেচনায় এনে পর্যবেক্ষণ ও অনু-নমুনায়নের উপর ভিত্তি করে ফেনী জেলার পরশুরাম থানায় বিস্তৃত আশা'র একটি ইউনিটের অন্তর্গত ২টি ইউনিয়নকে নমুনা এলাকার পরিসর হিসেবে বাছাই করা হয়। বাছাইকৃত দু'টো ইউনিয়নের মোট ৪টি গ্রামকে সুনির্দিষ্ট ভাবে গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে নির্ধারণ করা হয়।

একইভাবে মৌচাকের কর্মএলাকা হতে নরসিংদী জেলার নরসিংদী সদর থানার ৩টি গ্রামকে গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে নির্ধারণ করা হয়।

এরপর মাঠ পর্যায়ে উপস্থিত থেকে 'আশা' ও 'মৌচাক' এর বিভিন্ন সংগঠিত সমিতি সদস্যদের সাথে কথা বলে প্রত্যক্ষভাবে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। সংশ্লিষ্ট এনজিও'র মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা উপাত্ত সংগ্রহে সহযোগিতা করেন।

প্রাথমিক উৎসের তথ্য অনুসন্ধানের পদ্ধতি হিসেবে 'দৈবচয়িত নমুনা জরীপ' পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এ ক্ষেত্রে নির্ধারিত প্রশ্নপত্র পূরণ এবং সাক্ষাতকার গ্রহণ - এ দু'টো কৌশলের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়।

মোট ০৭টি গ্রামের জনগণের মধ্যে মৌচাক ও আশা'র সমিতি সদস্য ১৪০ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে প্রশ্নপত্র পূরণ করা হয়। প্রশ্নপত্র পূরণের বাইরে কয়েকজন সমিতি সদস্যের সাক্ষাতকার নেয়া হয়। এছাড়া আশার ফুলগাজী ইউনিটের ইউনিট ম্যানেজার এবং মৌচাকের নরসিংদী এলাকায় কর্মরত ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়।

সংগৃহীত তথ্যসমূহকে গুণগত এবং সংখ্যাগত এই দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করে সংখ্যাগত শ্রেনীবদ্ধকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন সংখ্যা ভিত্তিক সারণীতে সন্নিবেশন করা হয় এবং গুণগত তথ্যসমূহ বর্ণনামূলকভাবে উপস্থাপন করা হয়।

প্রাথমিক তথ্য উৎসকেই গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে বিষয় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বেসরকারী সাহায্য সংস্থার উপর লিখিত কিছু বই, প্রবন্ধ, গবেষণা

Dhaka University Institutional Repository

মনোগ্রাফ এবং বিশেষভাবে আশা কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। এসব প্রকাশিত পুস্তক একদিকে ধারণা উন্নয়নের ক্ষেত্রে এবং অপরদিকে বিষয় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। মূলতঃ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক - এই উভয় তথ্য উৎস ব্যবহার করে প্রাপ্ত চিত্র অর্থাৎ গবেষণার মাধ্যমে অর্জিত ফলাফল সারণীর সাহায্যে এবং বিশ্লেষণ করে অভিসন্দর্ভে উপস্থাপন করা হয়েছে। সবশেষে, তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে গবেষণার যে নির্দিষ্টতা নিরূপিত হয়, তার ভিত্তিতে সারমর্ম তৈরী করে উপসংহারে পৌছানো হয়েছে।

গবেষণা এলাকার বিবরণ

ক) ফেনী জেলাধীন পরশুরাম থানায় আশা'র ফুলগাজী ইউনিটের আওতাধীন এলাকাকে গবেষণার তথ্য জরিপের নির্দিষ্ট ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আশা ফুলগাজী ইউনিটের কর্মপরিধি পরশুরাম থানার ৪টি ইউনিয়নের ৩৮টি গ্রামের মধ্যে সম্প্রসারিত।

আশা ফুলগাজী ইউনিট কার্যালয়টি পরশুরাম থানার ভৌগলিক এলাকায় ফুলগাজী বাজারে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিকট অবস্থিত। ফেনী জেলা সদর হতে উত্তর দিকে ফুলগাজীর দূরত্ব ১৫ কিঃ মিঃ। সড়ক পথে ফেনী-পরশুরাম সড়কে পরশুরাম সদরের ৬ কিঃ মিঃ দক্ষিণে অবস্থিত ফুলগাজী। শ্রমশক্তি হিসেবে অংশগ্রহণকারী জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের কম।

এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান। তবে, ফুলগাজী ইউনিয়নে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হিন্দু ধর্মাবলম্বীও বসবাস করে। আশা'র কর্ম এলাকার জনসাধারণের অধিকাংশই অশিক্ষিত এবং তাদের প্রধান পেশা কৃষি। কৃষি উৎপাদনের পদ্ধতিতে আধুনিক উপাদান সংযোজিত হয়েছে। উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে ধান, গম, আখ, বাদাম, শাক-সব্জী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কৃষকদের মধ্যে অনেকেই ভূমিহীন। তারা অন্যের জমি বর্গা চাষ করে। কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট জনসাধারণ বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। যেমন ঃ

ক) ধনী বা উদ্বৃত্ত কৃষক

খ) মাঝারি বা প্রান্তিক কৃষক

গ) গরীব কৃষক ও ভূমিহীন কর্মজীবী

কৃষি কাজের বাইরে এই এলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক চাকরিজীবী। তারা চাকরির কারণে অন্য এলাকায় অবস্থান করছেন। তবে, তাদের পরিবার গ্রামে বাস করছে। অল্প সংখ্যক লোক কর্মস্থলে পরিবারসহ বাস করছে। এই এলাকার স্বল্প শিক্ষিত যুবকশ্রেণীর একটি ক্ষুদ্র অংশ দেশের বাইরে অভিবাসী শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে।

দরিদ্র পরিবারগুলোতে মহিলারা হস্তশিল্পের কাজ করেন। এছাড়া বন্যাপ্রবন এলাকা হওয়াতে মাছ ধরা ও মাছ বিক্রয়ের মাধ্যমেও কিছু লোক জীবিকা নির্বাহ করেন। এছাড়াও যেশকিছু লোক দিনমজুর, রিক্সা চালক, ক্ষুদ্র ব্যবসা, ছোট চাকুরী ও নির্মাণ কাজে জড়িত।

Dhaka University Institutional Repository

আশা ফুলগাজী ইউনিটের আওতাধীন এলাকার অবকাঠামো কিছুটা উন্নত। ফুলগাজী ইউনিয়ন এলাকার অভ্যন্তরে অর্ধেক রাস্তাই পাকা। তবে চিথলিয়া ইউনিয়নে চিথলিয়া-ধনীকুন্ডা সড়কটি পাকা হলেও অন্যান্য রাস্তাগুলো মাটির তৈরী। বর্ষাকালে সড়ক পথে চলাচল অসুবিধাজনক।

ফুলগাজী ইউনিয়নে কলেজ, হাইস্কুল, গার্লস হাইস্কুল, হাসপাতাল, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কারিগরী শিক্ষা কেন্দ্র ও মহিলাদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে।

অন্যদিকে চিথলিয়া ইউনিয়নে কোন কলেজ না থাকলেও ৪টি হাইস্কুল ও ২টি বড় মাদ্রাসা আছে। এই ইউনিয়নে নারী শিক্ষার হার তুলনামূলকভাবে বেশী। গ্রামের মেয়েরা এসএসসি পরীক্ষা পাশের পর উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে পড়াশুনার জন্য পরশুরাম সরকারী কলেজে যায়। যে চারটি গ্রামের ওপর জরিপ পরিচালিত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে - ফুলগাজী ইউনিয়নের ধনিয়ামোড়া, শ্রীপুর, বিজয়পুর এবং চিথলিয়া ইউনিয়নের শালধর। এ গ্রামগুলো আশা ফুলগাজী ইউনিটের আওতাধীন গ্রামগুলোর মধ্যে প্রতিনিধিত্বশীল গ্রাম বলে বিবেচিত হয়েছে এবং এই চারটি গ্রামের আর্থ-সামাজিক চরিত্র অত্র এলাকার সাধারণ চরিত্রের অনুরূপ।

খ) নরসিংদী জেলার নরসিংদী সদর থানার অধীন কাউরিয়াপাড়া, সাটিরপাড়া ও বিলাসদী গ্রামকে গবেষণার তথা জরীপের নির্দিষ্ট ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মৌচাক এর নরসিংদী সদর এলাকা অফিস নরসিংদী শহরে অবস্থিত। বাংলাদেশ সরকারের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের জেলা পর্যায়ের অফিস ভবনের নীচ তলায় 'মৌচাক'- এর জোনাল ও এরিয়া অফিস অবস্থিত। একই ভবনে সরকারী সংস্থা ও এনজিও অফিসের কার্যক্রম জিও-এনজিও সুসম্পর্কের পরিচায়ক।

ঢাকা থেকে ট্রেন বা বাসযোগে নরসিংদী গিয়ে রিকশায় মৌচাকের নরসিংদী এলাকা অফিসে যাওয়া যায়। এখান থেকে রিকশা বা সাইকেলেও গবেষণা এলাকায় যাওয়া যায়।

নরসিংদী থানার অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ, তবে এই এলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হিন্দু বসবাস করে। স্বল্প সংখ্যক বৌদ্ধ ও খৃষ্টান জনবসতিও এই এলাকায় রয়েছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান পেশা ব্যবসা। নরসিংদী পৌর এলাকায় ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্টদের উল্লেখযোগ্য অংশ অমুসলিম।

কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি (যান্ত্রিক জলসেচ ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার বাদে) মূলতঃ সনাতনী ধরনের। কৃষির সাথে সম্পৃক্ত জনসাধারণ বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই এলাকার মানুষ কাজ করছে এবং নিয়মিত বৈদেশিক মুদ্রা পাঠাচ্ছে। এলাকায় খাল-বিল ও পুকুর থাকায় মৎস্য শিকারের কিছুটা সুযোগ রয়েছে। মৌচাকের নরসিংদী কর্মএলাকায় প্রাইমারী স্কুল, হাইস্কুল, মাদ্রাসা, গার্লস স্কুল ও কলেজ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা এলাকা হিসেবে নির্ধারিত গ্রাম তিনটি মৌচাকের নরসিংদী এলাকার আওতাধীন গ্রামগুলোর মধ্যে প্রতিনিধিত্বশীল গ্রাম বলে বিবেচিত হয়েছে এবং এই তিনটি গ্রামের আর্থ-সামাজিক চরিত্র অত্র এলাকায় সাধারণ চরিত্রের অনুরূপ ।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্যের ধারণা বিশ্লেষন

'দারিদ্র্য' ধারনাটির উৎপত্তি হয়েছে বঞ্চনা থেকে অর্থাৎ 'দারিদ্র্যকে বলা যেতে পারে একটি বঞ্চনার কাহিনী'[৩] (অমর্ত্য সেন ৯৮) । উন্নয়নশীল দেশসমূহে দারিদ্র্যকে চরম বঞ্চনার সমার্থক হিসেবে গণ্য করা যায়, যা জীবন ধারনের ন্যূনতম চাহিদার সাথে সংশ্লিষ্ট ।

UNDP এর মুখপত্র The Choice - এ দারিদ্র্য সম্পর্কে চিন্তাশীল ও সাধারণ ব্যক্তিদের ৬১টি সংজ্ঞা সন্নিবেশিত হয়েছে । The Choice থেকে কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো -

* Save the Children (USA) - এর প্রেসিডেন্ট চার্লস ম্যাক করম্যাক বলেছেন "একটি শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনাগুলো বিকাশের সুযোগের অভাবই দারিদ্র্য ।"[৪]
* হাইতির প্রেসিডেন্ট বারট্রান্ড এরিষ্টাইড এর ভাষায়, "দারিদ্র্য হলো সামাজিক ভিত বা উপাদান খুড়ে খাওয়া এক ব্যাপার যা বিশ্ব শান্তির জন্য হুমকি ।"[৫]
* গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রফেসর ইউনুছ বলেছেন, "দারিদ্র্য হচ্ছে সব রকম মানবাধিকারের অস্বীকৃতি । দারিদ্র্য দরিদ্রদের সৃষ্ট নয় । দারিদ্র্য সৃষ্টি করেছে আমাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ, নীতিসমূহ ।"[৬]

দারিদ্র্য তাই শুধু আয় উপার্জনের সক্ষমতাকে ধারণ করে না একই সাথে তা নারী-পুরুষ সমতা, দারিদ্র বিমোচনমুখী প্রবৃদ্ধি, বিশ্বায়ন এবং উন্নয়ন তদারকীর মতো ইস্যুকেও অন্তর্ভূক্ত করে ।

দারিদ্র্য ঃ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও বিগত তিন দশকে দারিদ্র্য বেড়েছে । প্রতিদিন প্রতি মিনিটে প্রায় ৫০টি শিশু দারিদ্র্যের মুখোমুখি হচ্ছে । "বিশ্বে আজ ৩০০ কোটি মানুষ দৈনিক মাথাপিছু দুই ডলারের কম অর্থে জীবন যাপন করছে । ১৩০ কোটি মানুষ বিশুদ্ধ পানি পায় না । ১৩ কোটি শিশু স্কুলে যেতে পারে না । অনাহারজনিত রোগ ব্যাধিতে দৈনিক মারা যায় ৪০ হাজার শিশু । এসব বঞ্চনার আরো একটি মাত্রা হচ্ছে নারীদের দুর্দশা, পর্যাপ্ত আর্থিক সঙ্গতির অভাব, চিকিৎসার অভাব ও সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয়ে কোটি কোটি বালিকা ও মহিলার জীবন ঝড়ে পড়ছে অকালে ।[৭]

ইউনিসেফ প্রদত্ত পরিসংখ্যান মতে, বর্তমান অর্থনৈতিক গতিধারা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবনতা অব্যাহত থাকলে জনসংখ্যা চারগুণ বেড়ে যাবে ।

---

[৩] আনিসুর রহমান, "অমর্ত্য সেন এবং অর্থনৈতিক মানবিকীকরণ" উন্নয়ন পদক্ষেপ, ১৩শ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮,
[৪] UNDP, The Choice, 1996
[৫] Ibid, P-3
[৬] [illegible], প্রফেসর মোঃ ইউনুস-এর সাক্ষাতকার, দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯৮
[৭] UNIC, জাতিসংঘ সংবাদ, নভেম্বর ১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব জনসংখ্যার ২০% বিত্তবান ও ২০% বিত্তহীন মানুষের আয়ের আনুপাতিক হার ১৯৬০ সালে যেখানে ৩০ ঃ ১ ছিল, ১৯৯১ সালে তা হয়েছে ৬১ ঃ ১।

বিশ্ব জনসংখ্যার ২০% লোকের দৈনিক আয় এক ডলারেরও কম। বিশ্বব্যাপী বর্তমানে ১০০ কোটি গরীব লোক পল্লী এলাকায় বাস করে। বিশ্বের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বেশীরভাগ লোকই ৪৮টি স্বল্পোন্নত দেশে বাস করে। জাতিসংঘের ১৯৭১ সালের হিসেবে স্বল্পোন্নত দেশের সংখ্যা ছিল ২৫টি। এখন এই সংখ্যা ৪৮ এ উন্নীত হয়েছে। উন্নয়নশীল বিশ্বের এক চতুর্থাংশ মানুষ এখনও দরিদ্রতার মধ্যে বসবাস করছে। প্রায় এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ১.৩ বিলিয়ন মানুষের আয় দৈনিক এক ডলারেরও কম।[৮]

দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ মানুষ মানব-দারিদ্র্য দ্বারা আক্রান্ত। এই অঞ্চলের ৫১৫ মিলিয়ন মানুষ আয়জনিত দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছে। দক্ষিণ-এশিয়া, পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ১.৩ বিলিয়ন মানুষের মধ্যে ৯৫০ মিলিয়ন মানুষ হচ্ছে আয়জনিত দরিদ্র।

অন্যদিকে সাব সাহারা আফ্রিকায় বেশীর ভাগ মানুষ মানব দারিদ্র্যের শিকার। এঅঞ্চলের ২২০ মিলিয়ন মানুষ আয়জনিত দরিদ্র। ২০০০ সাল নাগাদ সাব সাহারা আফ্রিকার অর্ধেক মানুষই আয়জনিত দরিদ্র হয়ে পড়বে।

শিল্পোন্নত দেশের ১০০ মিলিয়ন মানুষ আয়জনিত দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করছে এবং ৩৭ মিলিয়ন মানুষ বেকার। অনেক উন্নত দেশে দারিদ্র্য মোকাবেলায় পরিচালিত অনেকগুলো কল্যাণমূলক খাত সংকোচন করা হয়েছে। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মতো শিল্পোন্নত দেশেও উল্লেখযোগ্য হারে দারিদ্র্য বাড়ছে।

দারিদ্র্য ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

১৯৯৭ সনের জাতিসংঘ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে Human Poverty ক্রমমান অনুযায়ী মানব দারিদ্র্য সূচকে বাংলাদেশের ক্রমমান-৬৭। এদেশে একই সাথে দারিদ্র্যের হার এবং দরিদ্র ব্যক্তির মোট সংখ্যা দুটোই বেশী।

দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিপরীতে দরিদ্র জনসংখ্যার অনুপাত বেড়েছে। অতীতে বিভিন্ন গবেষণাতে '৮০ এর দশকে জনপ্রতি গড় আয়বৃদ্ধির তথ্য থাকলেও দারিদ্র্য হ্রাসের তথ্য আসেনি। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে ৫ কোটি লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করতো, ১৯৯৭ সালে এই সংখ্যা হয়েছে ৬ কোটি।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) - এর এপ্রিল '৯৬ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হার ৫১.৭%, আর চরম দরিদ্র ২২.৫%।

ক্যালরী গ্রহণের ভিত্তিতে দারিদ্র্য নিরুপনের মাপকাঠি হচ্ছে পূর্ণবয়স্ক যে লোক ২১২২ কিলোক্যালরির কম খাদ্য গ্রহণ করে সেই দরিদ্র। অন্যদিকে চরম দরিদ্র নির্ণয়ের মাপকাঠিতে বলা হয়েছে, যে লোক দৈনিক ১৮০৫ কিলো ক্যালরির কম খাদ্য গ্রহণ করে সে-ই চরম দরিদ্র।

---

[৮] UNDP, মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৩ সনে প্রকাশিত বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, "১৯৮১/৮২ ও ১৯৮৩/৮৪ সালের জন্য জনপ্রতি দৈনিক ২২০০ ক্যালরী হিসেবে দরিদ্র নির্ণয় করা হয়েছে। পরবর্তী বছরের জন্য এই সংখ্যা ২১২২ ক্যালরি ধরা হয়েছে।"[৯]

বাংলাদেশের নারীরা পুরুষের চাইতে অধিকতর গরীব। কেননা পুরুষ- প্রধান পরিবারের চাইতে নারী-প্রধান পরিবার আয়জনিত দারিদ্র্য রেখার নীচে পতিত হয় বেশী। দারিদ্র্যের নারীমুখীকরণের অর্থ কেবল এই নয় যে, সংখ্যার দিক থেকে পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী নারী গরীব বরং তা তাদের নিজেদেরকে এবং তাদের সন্তানদের দারিদ্র্যের ফাঁদ থেকে রক্ষা করতে গিয়ে দারিদ্র্যের যে তীব্রতা ও নিদারুণ কষ্টের ধকল সহ্য করতে হয় সেই সত্য প্রকাশ পায়। শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং সম্পত্তি লাভের ক্ষেত্রে নারীর অসম সুযোগ-সমাজের এ সব পক্ষপাতদুষ্টতার ফল হল নারীর অত্যন্ত সীমিত সুযোগ-সুবিধা। দরিদ্রতা অবশেষে তাই লিঙ্গ বৈষম্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং দরিদ্রতার ছোবলে নারীরাই হয় সবচেয়ে অসহায়।

বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টা মূলতঃ দারিদ্র্য সমস্যাকে ঘিরে আবর্তিত। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় দারিদ্র্য বিমোচনকে উন্নয়নের লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

দারিদ্র্যের কারণ বহুবিধ এবং এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে গবেষক ও তাত্ত্বিকদের মধ্যে। তবে সাধারণভাবে কিছু বিষয়কে দারিদ্র্যের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়[১০], যেমন

* সম্পদ ও সুযোগ সুবিধার অন্যায্য বন্টন
* অসম বাজার ব্যবস্থা
* পরিবেশ দূষণ ও তার ক্ষয়
* জবাবদিহিমূলক গণতন্ত্র ও সুশাসনের অভাব
* অশিক্ষা
* অত্যাধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে অদক্ষতা
* ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা
* প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব।

দারিদ্র্য একটি জটিল সমস্যা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে এই জটিলতার উৎস বহুমুখী। সব দেশে দারিদ্র্যের চেহারাও এক নয়। দারিদ্র্যকে মোকাবেলার ধরণ নিয়েও বিভিন্নতা রয়েছে। তবে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল, আয় বন্টনের অসমতা এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের বিষয়টি প্রত্যেক দেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

---

[৯] বাংলাদেশ সরকার, পরিকল্পনা কমিশন প্রতিবেদন, ১৯৯৩

[১০] মোজাম্মেল হোসেন, "দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির যোগফল" অধুনা, মার্চ ১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল

'দারিদ্র্য বিমোচন' শব্দটির মধ্যে অর্থনৈতিক দিক অপেক্ষা মানবিক দিকের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। কৌশলগত বিবেচনায় দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আলোচিত পদ্ধতিসমূহের মধ্যে অন্যতম তিনটি পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

TRICLE DOWN THEORY ঃ পাকিস্তান আমলে সূচিত এলিট শ্রেণীমুখী উন্নয়নের মূল বক্তব্য হচ্ছে "Tricle Down Theory" বা চুঁইয়ে পড়া তত্ত্ব। এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য হচ্ছে সমুদয় সম্পদ ব্যয় হবে মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর জন্য। তা থেকে ছিটেফোটা উপচে পড়বে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ গরীবের মাঝে।

TRICLE UP THEORY ঃ IFAD এর প্রধান মিঃ ইদ্রিস জাজায়েরী Tricle-Up মডেল নামে উন্নয়নের অপর এক মডেলের কথা বলেছেন যা তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে উপরের দিকে যাবে। উন্নয়ন বরাদ্দের বেশীরভাগ অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছানোর লক্ষ্যেই এই তত্ত্বের উৎপত্তি। দারিদ্র্য বিমোচনে Tricle -up তত্ত্বকে কার্যকর করতে হলে অগ্রাধিকার দিতে হবে কৃষিকে, যে খাতে জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ নিয়োজিত এবং যাদের ৮৬% ভাগ দরিদ্র। এক্ষেত্রে অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের 'Empowering the poor নীতি গ্রহণ করতে হবে এবং সে লক্ষ্যে কৃষিখাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। কৃষকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের অধিকার দিতে হবে। একই সাথে নারী সমাজকে সম্পৃক্ত করতে হবে উন্নয়নের স্রোতধারায়।

PARTICIPATORY DEVELOPMENT MODEL ঃ এ মডেলে কর্মরত মানুষ বা উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষ উন্নয়নের মুখ্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। এই মডেলে মানুষ সমস্যা নয় বরং মানুষই সমস্যার সমাধান। দারিদ্র্য দূর করাই যদি মুখ্য বিষয় হয়ে থাকে, তাহলে মানুষের সৃজনশীল উদ্যমকে কাজে লাগাতে হবে, তৃণমূল পর্যায়ে সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। এটি হচ্ছে দারিদ্র্য নিরসনের স্বীকৃত কৌশল।

দারিদ্র্য ও উন্নয়ন

উন্নয়ন মানে পূর্ববর্তী অবস্থানের চেয়ে আরো উন্নত অবস্থানে অধিষ্ঠান, সমাজে নিম্নতর অবস্থা থেকে বিভিন্ন মানবিক অবস্থার উন্নতি সাধনকল্পে উন্নত অবস্থানে পদার্পন। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেন বলেন "জনগণের সক্ষমতার বিকাশই উন্নয়ন। মানুষের সক্ষমতা নির্ভর করে তার স্বত্বাধিকারের উপর। 'আয় বৃদ্ধি' উন্নয়নের চরম লক্ষ্য নয়, লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় মাত্র। উন্নয়নের চূড়ান্ত লক্ষ্য সক্ষমতা, মানুষের নিজের জীবনের উপর অধিকার"।[১১]

জাতিসংঘ থেকে প্রকাশিত UN Briefing Paper : The World Conference শীর্ষক প্রতিবেদনের শুরুতে বলা হয়েছে "Development should be centred on human beings-because an individual's well being is multifaceted. A multidimensional approach to development is essential".

---

[১১] উন্নয়ন কথা, উন্নয়ন ধারণা, পৃষ্ঠা নং ৬, ঢাকা, ১৯৯২

Dhaka University Institutional Repository

এই প্রতিবেদনের অপর অংশে উল্লেখ করা হয়েছে "Central goals of development include the eradication of poverty, the fulfilment of the basic needs of all people and the protection of all human rights and fundamental freedom-the rights to development among them".

১৯৯৭ সালে দক্ষিণ এশিয়ার মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের মুখবন্ধে ডঃ মাহবুব-উল হক লিখেছেন, "উন্নয়নের লক্ষ শুধুমাত্র আয় বাড়ানো নয় বরং মূল লক্ষ হলো জনগণের পছন্দের তালিকাকে বিস্তৃত করা। যে সব পছন্দের মাঝে থাকবে উপযুক্ত মানের শিক্ষা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ভাল স্বাস্থ্য, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, সামাজিক অংশগ্রহণ, পরিবেশগত নিরাপত্তা এবং মানুষের ভাল থাকার জন্য প্রয়োজনীয় নানা ক্ষেত্র।"

জাতিসংঘের Fact Sheet এ উন্নয়ন সম্পর্কে বলা হয়েছে- "Development, in a broad sense, refers to social and economic charges in society leading to improvement in the quality of life for all. At the most basic level, it means providing for every person the essential meterial requirements for a dignified and productive existance."

গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ইউনুছ এর ভাষায়, "আমার কাছে উন্নয়নের সংজ্ঞা হচ্ছে 'অর্ধেকাংশ মানুষের জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসা'। অর্থাৎ যিনি অন্যের তুলনায় যতবেশী নীচে, তিনি তত বেশী অগ্রাধিকার পাবেন।"

উন্নয়ন পরিমাপের জন্য ইউএনডিপি 'মানব উন্নয়ন সূচক' নামক নতুন পরিমাপ অনুসরণ করছে যাতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে -

ক) নাগরিকদের গড় আয়

খ) স্বাক্ষরতা

গ) জনগণের ক্রয় ক্ষমতা

পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদ ডঃ মাহবুবুল হক "উন্নয়ন অন্বেষণ" বইতে 'উন্নয়ন' প্রত্যয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে -

"উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূল কেন্দ্রবিন্দু মানুষ। মানুষের জন্যই উন্নয়ন এবং মানুষই উন্নয়ন নীতি প্রনয়ন, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করবে। এক কথায় 'Man is the subject and object of development.[১২]"

উন্নয়ন যদি মানুষের জন্য হয় তবে প্রথমেই আসে মানুষের সুপ্ত শক্তি বিকাশের বিষয়টি। মানুষ সৃজনশীল, উদ্ভাবনী শক্তি সম্পন্ন ও সুরদর্শী। তবে মানুষের এসব গুনাবলীর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হলে মানুষকে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিকশিত করার বিকল্প কিছু নেই। উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন মানবিক ও বস্তুগত সম্পদ এবং এ দু'য়ের সমন্বয়। এ জন্য প্রয়োজন লোকদের নিজেদের ও স্থানীয় সমাজের মানবিক ও বস্তুগত উভয় সম্পদ সর্বাগ্রে চিহ্নিত করা এবং উন্নয়ন কাজে তা ব্যবহার করা।

---

[১২] মাহবুবুল হক, উন্নয়ন অন্বেষণ, পালক ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৫

Dhaka University Institutional Repository

একজন লোকের মানবিক সম্পদ হলো - (ক) আত্ম-সচেতনতা (খ) সৃজনশীলতা (গ) পরিবর্তন আনয়নের ইচ্ছা। এই তিনটি মানবিক সম্পদের সমন্বয় ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। এর ফলে, মানুষ "সম্পদ লাভ করার" চেয়ে, নিজে 'সম্পদ স্বরুপ হওয়া'র উপর প্রাধান্য দেয়।

দারিদ্র্য একটি বহুমাত্রিক জটিল সমস্যা, যার মূল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংগনে নিহীত। এর কোনো সহজ বা একমাত্রিক উত্তর নেই, বরং দারিদ্র্য মোচনে সুনির্দিষ্ট দেশভিত্তিক কর্মসূচী এবং তার পাশাপাশি সহায়ক আন্তর্জাতিক পরিবেশ গড়ে তোলা এ সমস্যা সমাধানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

দারিদ্র্য ও ক্ষুধা মোচন, আয় বন্টনে অধিকতর সমতা এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন বর্তমান বিশ্বের একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার দায়িত্ব সকল দেশের।

দারিদ্র অর্পিত কোন ব্যাপার নয় বরং তা মানবতার একটি ব্যাধি। এই ব্যাধি সবচেয়ে মৌলিক মানবাধিকার 'বেঁচে থাকার অধিকার'কে ক্ষুন্ন করে। জাতিসংঘের মহাসচিব বুটোস ঘালি মনে করেন "চরম দারিদ্র্য মোটেই অনিবার্য নয়; এটি একটি অগ্রহণযোগ্য অভিশাপ।"[১৩]

দারিদ্র্য ও উন্নয়ন সামঞ্জস্যহীন। চরম দারিদ্র্য মোচনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ সরকার ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে এই আস্থারই বহিঃপ্রকাশ যে, এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব এবং তা করতেই হবে।

"দারিদ্র্য মোচনের কাজটি জিএনপি বৃদ্ধির চেয়ে অনেক বেশী বড়। এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ায় রয়েছে কর্মসংস্থানের মতো অর্থনৈতিক উপাদান এবং মৌলিক চাহিদা পূরণ, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়াতে জনগণের অংশগ্রহণ। দারিদ্র্য মোচনের সংগ্রামের অর্থ হলো যুগপৎ মানবিক মর্যাদা এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষে সংগ্রাম"।[১৪]

গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর ইউনুছ বলেন, "দারিদ্র্য অ-দরিদ্রদের সৃষ্ট।" কথাটির অর্থ দাঁড়ায় যারা সম্পদশালী তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলস্বরুপ সৃষ্টি হচ্ছে দারিদ্র্য। বর্তমান বিশ্বের উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমশই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনের মধ্যে তেমন কোন বিরোধ নেই। শিল্পোন্নয়নের গোড়ার দিকের অভিজ্ঞতা উন্নয়নশীল দেশগুলোর দারিদ্র্য কমাতে সহায়ক হয়নি।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য এমন পথ বেছে নেয়া উচিত যা প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য লাঘব করতে সহায়ক হবে। তবে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে এটাও স্পষ্ট যে, দরিদ্রদের জন্য প্রবৃদ্ধির সুফল তখনই বেশী হয়, যখন কোন দেশে সম্পদ বন্টনের অসাম্য কম থাকে। এই উপযুক্ত ধরনের প্রবৃদ্ধির কৌশল গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ বা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে রাজনৈতিক সচেতনতা এবং নিবেদিত প্রচেষ্টা আছে কিনা

---

[১৩] UNIC, জাতিসংঘ সংবাদ, ঢাকা, ১৯৯৬

[১৪] প্রফেসর মোঃ ইউনুস-এর সাক্ষাতকার, দৈনিক জনকণ্ঠ,১৫ ডিসেম্বর ১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

তার উপরই নির্ভর করছে প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য দূরীকরণ। দারিদ্র্য হ্রাস করার ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই চরম দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব। বিংশ শতাব্দীতে দারিদ্র্য বিমোচনে দ্রুত অগ্রগতি শুরু হয়। আয় বৃদ্ধির ফলে জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

দারিদ্র্য থেকে মুক্তিলাভের অগ্রযাত্রা সূচিত হয় ১৯৫০ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তিলাভ করে এসব দেশ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে প্রভূত উন্নতি সাধন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে নাটকীয়ভাবে দারিদ্র্য প্রতিরোধ করতে শুরু করে। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্ব জনসংখ্যার ৩-৪ বিলিয়ন মানুষ তাদের জীবনযাত্রার মানের প্রকৃত উন্নয়ন সাধন করছে এবং ৪-৫ বিলিয়ন মানুষ মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির সুযোগ পেয়েছে। এই বাস্তবতাই প্রমান করে যে দারিদ্র্য দূরীকরণ কোন সুদূরপ্রসারী চিন্তাই শুধু নয় বরং বাস্তবতাও বটে।

দরিদ্র জনগণকে কার্যকর মানব সম্পদে পরিণত না করা পর্যন্ত দেশকে কোনভাবেই দারিদ্রমুক্ত করা সম্ভব নয়। যাদেরকে দরিদ্র বা দারিদ্র্যসীমার নীচের লোক বলে ধরা হচ্ছে তাদের বিপুল পরিমান শক্তি ও সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগানো গেলে এক সময় তারা নিজেরাই শুধু দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে না, বরং সারা দেশের দারিদ্র্য দূরিভূত করতেও সক্ষম হবে।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উৎসাহ, নির্দেশনা, প্রশিক্ষণ ও সহায়তা দেয়া হলে এরা যে অসীম সৃজনশীলতা দেখাতে পারে, তা বিশ্বের অনেক দেশেই প্রমানিত হয়েছে। সুইজারল্যান্ড ও জাপানে ক্ষুদ্র কুটির শিল্পই উন্নতির ভিত মজবুত করেছে।

দারিদ্র্য বিমোচনের উপায়সমূহ

ক) দরিদ্রদের সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে সচেতনতা ও আত্মনির্ভরশীলতার মাধ্যমে সামাজিক সমাবেশীকরণ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

খ) সম্পদ ও সুযোগ সুবিধার সুষম ও সুষ্ঠ বন্টন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

গ) চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সুবিধা বৃদ্ধি ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা।

ঘ) পরিবেশ রক্ষার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়ন সাধন।

ঙ) নারীর ক্ষমতায়ন এবং বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত কর্মসূচীর পূর্ণ বাস্তবায়ন করা।

চ) জবাবদিহিমূলক গণতন্ত্র নিশ্চিত করা।

ছ) সুশাসনের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সাধন করা।

Dhaka University Institutional Repository

দারিদ্র্য বিমোচনে বেসরকারী উদ্যোগ

ষাট এর দশক থেকে মূলধারায় উন্নয়ন প্রচেষ্টায় দারিদ্র্য বিমোচনের উপায় অনুসন্ধান করা হয়েছে কেবল প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই এর কৌশল সীমিত ছিল। উন্নততর প্রযুক্তি প্রবর্তন ও সেগুলোর ব্যবহার সম্প্রসারণের মাধ্যমে শস্যের ফলন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কিছুটা সাফল্য অর্জিত হয়েছে বটে, কিন্তু তা দারিদ্র্য নিরসনে তেমন কোন প্রভাব রাখতে পারেনি। বরং আধুনিকায়নমুখী এই উন্নয়ন কৌশল গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়াকে জোরদার করেছে। তথাকথিত উচ্চ ফলপ্রদায়ী কৃষি উপকরণ ক্রয়ের সামর্থ্য না থাকায় দরিদ্র কৃষকদের অনেকেই বহুল প্রচারিত সবুজ বিপ্লব-এ অংশগ্রহণ করতে গিয়েও টিকে থাকতে পারেনি, তাদেরকে ধনী কৃষক বা মহাজনদের কাছে নিজেদের জমি খোয়াতে হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষনীয় ছিল যে, খাদ্য উৎপাদন বাড়লেই তা দরিদ্রদের হাতে যাবে এই ধারণা সঠিক নয়। অন্যটি হচ্ছে উন্নয়ন শুধু অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত বিষয় নয় বরং তা অনেক বেশী রাজনৈতিক।

দারিদ্র্য বিমোচনে বেসরকারী উদ্যোগ অর্থাৎ এনজিও প্রচেষ্টার সূচনা হয়েছে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সেসব মানুষকে বিজড়িত করার মাধ্যমে, যাদেরকে মূলধারার উন্নয়ন কর্মকান্ড পাশ কাটিয়ে গেছে অথবা যাদের জীবন ও জীবিকাকে ইতিবাচকভাবে স্পর্শ করতে পারেনি।

টেকসই উন্নয়ন প্রচেষ্টায় মনে করা হয় যে, "দরিদ্র ও পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী দায় নয় বরং এরা সম্ভাবনময় সম্পদ। কারণ টেক্সই উন্নয়ন একটি নতুন ধরনের উন্নয়ন যা সম্পদ সংরক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে পূর্ণতা দেয়। এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদাকে অক্ষুন্ন রেখে বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজনকে পূরণ করে"।[১৫] দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সহজাত গতিশীলতাকে উৎপাদন স্তরে নিয়ে আসার উৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধন। এই প্রক্রিয়াকে সফল করতে হলে এনজিওদের সম্মিলিত ধনাত্মক প্রচেষ্টা সুফল বয়ে আনতে পারে। কেননা এনজিওদের রয়েছে উন্নয়ন কর্মী এবং উন্নয়ন প্রচেষ্টায় নিবেদিত বিভিন্ন কর্মসূচী।

সংগঠন নির্মাণ, প্রচেতনীকরণ এবং নানাবিধ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সমন্বিত একটি প্রক্রিয়ায় বিজড়নের মাধ্যমে দরিদ্রদের সামর্থ্য তৈরী ও ক্ষমতায়ণ বাড়িয়ে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও প্রতিষ্ঠাণের অভিগম্যতা সৃষ্টি বিকল্প উন্নয়ন প্রচেষ্টার কতিপয় কৌশল।

দারিদ্র্য বিমোচনে বেসরকারী উদ্যোগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহের অন্যতম হচ্ছে দরিদ্রদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করা। মহাজনী ঋণের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণের সফলতা বাংলাদেশকে পৃথিবীতে নতুন পরিচয়ে পরিচিত করেছে। ক্ষুদ্র ঋণের প্রবক্তা প্রফেসর মুহম্মদ ইউনুছ পেয়েছেন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। গ্রামীণ ব্যাংকের মডেল এখন দেশের ভৌগলিক সীমা অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের অন্যান্য দেশে। ক্ষুদ্র ঋণ দারিদ্রতা থেকে কতটুকু মুক্তি দিতে সক্ষম হয়েছে এ প্রশ্নের শুদ্ধ গানিতিক উত্তর দেয়া সম্ভব না হলেও বহু ঘটনা, সমীক্ষা এবং

Dhaka University Institutional Repository

অভিজ্ঞতালব্ধ প্রমান থেকে এটা স্পষ্ট যে, মহাজনী ঋণের শোষণ থেকে বহুলাংশে মুক্ত করার ক্ষেত্রে এবং আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে ক্ষুদ্রঋণ অনেকাংশে সহায়ক হয়েছে।[১৬]

দারিদ্র্য বিমোচন তথা উন্নয়ন কর্মকান্ডে দরিদ্রদের অংশগ্রহণ এবং তাদের সাফল্যকে স্থায়িত্বশীল করতে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। এনজিওরা তাই বয়স্ক শিক্ষা ও উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করছে।

বেসরকারী উন্নয়ন প্রয়াসে আরেকটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্র হচ্ছে স্বাস্থ্য। দারিদ্র্য বিমোচন প্রক্রিয়ায় এ বিষয়টিকে খাটো করে দেখার কোন অবকাশ নাই। এক্ষেত্রে এনজিওদের কর্মকান্ড সুবিদিত। অতি ভংয়ংকর ৬টি ব্যাধির প্রতিষেধক টিকা গ্রহণকারী মা ও শিশুর সংখ্যাকে এক দশকের মধ্যে ৫% থেকে ৮৫% এ উন্নীত করার ক্ষেত্রে এনজিওদের রয়েছে প্রশংসনীয় অবদান।

পরিবেশের ক্ষয় ও বিনাশ দরিদ্রদের সম্পদভিত্তিকে ক্ষীণতর ও নড়বড়ে করে তো বটেই, অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয় যা দারিদ্র্যায়ন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে। সূচনালগ্ন থেকে তাই এনজিওরা পরিবেশসম্মত উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করছে। এনজিওসমূহের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সংগঠিত দরিদ্র জনগোষ্ঠী এ পর্যন্ত ১০ কোটিরও বেশী গাছ রোপন করেছে।

বেসরকারী দারিদ্র্য বিমোচন প্রয়াসের সবচেয়ে বড়ো সাফল্য হচ্ছে মূলধারার উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে প্রভাবিত করা। যেমন- প্রথমতঃ দরিদ্রদের সংগঠিত করার যে উদ্যোগ সত্তর দশকে এনজিদের মাধ্যমে সূচিত হয়েছিল তা বর্তমান মূলধারাতেও সংযোজিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত ঃ ক্ষুদ্র ঋণের ধারনাটি সরকার গ্রহণ করেছে এবং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং সদ্য গঠিত কর্মসংস্থান ব্যাংকের মাধ্যমে দরিদ্রদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের জন্য ঋণ দেয়া হচ্ছে।

তৃতীয়ত ঃ মানবিক উন্নয়নকে উন্নয়নের অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

জাতিসংঘ প্রকাশিত ১৯৯৪ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'আশির দশকের পর হতে দেশে দারিদ্র্যের পরিমান কমছে।' এর কারণ হিসেবে বিআইডিএস এর 'পোভার্টি সেল' কিছু ইতিবাচক সূচক চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে দরিদ্র মানুষের অংশ গ্রহণ।

উল্লেখ্য, সত্তর -এর দশক থেকেই এনজিওরা মানবিক উন্নয়নের ধারনাকে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে এবং ইদানিং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচীর জোরালো প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে এটিকে উন্নয়নের অপরিহার্য একটি দিক হিসেবে স্বীকৃতি পেতে সহায়তা করেছে। একই সাথে দারিদ্র্য বিমোচনে এনজিও

---

[১৫] এজাজুল হক চৌধুরী "স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন ও বাংলাদেশ" সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা ১৯৯৭

[১৬] মোকাম্মেল হোসেন, "বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে এনজিও'র ঋণ ও বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রসংগ উন্নয়ন বিতর্ক, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ, ঢাকা ,১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রমের ক্রমশঃ বিস্তৃতি ঘটছে এবং একাজে সরকারের সমর্থন, সহযোগিতা ও সমন্বয় অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়েছে। যদিও আভিধানিক অর্থে সরকারী মালিকানা বা পরিচালনাধীন নয় এমন যে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানই এনজিও, কিন্তু বাস্তবে এনজিও বলতে আমরা সেসব প্রতিষ্ঠানকেই বুঝে থাকি যে সব প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছাপ্রনোদিতভাবে জনগণের কল্যাণের জন্য সংগঠিতভাবে কাজ করে থাকে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ বিভাগ বা এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর রেজিষ্ট্রেশন গ্রহণ করতে হয়।

NGO এর সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্ক থাকায় কেউ কেউ NGO কে Private Voluntary Development Organisation (PVDO) নামেও অভিহিত করেছেন।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে এনজিও'র ক্রমবিকাশ

বেসরকারী পর্যায়ে উন্নয়ন প্রচেষ্টার ইতিহাস অতি পুরাতন। মানব সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের মনে অপরের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা বা চিন্তা থেকেই স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন প্রয়াস শুরু হয়। প্রাচীনকালে রাজা-বাদশাহ্ এবং সমাজের অবস্থাসম্পন্ন লোকরা প্রজারঞ্জনার্থে অথবা পূণ্য লাভের আশায় নানা ধরনের জনহিতকর কাজ করেছেন।

মুঘল আমলের রাজারা রাস্তার দু'পাশে সরাইখানা নির্মাণ করতেন, দাতব্য চিকিৎসালয় চালু রেখেছিলেন। ১৮৮৭ সালে স্বামী বিবেকানন্দের উদ্যোগে রামকৃষ্ণদেবের মানবসেবার আদর্শে গড়ে উঠেছিল রামকৃষ্ণ মিশন। আর্য সমাজে থিয়োসফিকাল সোসাইটির মতো সংগঠনগুলোর ক্ষেত্রও ব্যাপকতর হয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য উদার মানবতাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজ সংস্কারের কাজে এগিয়ে এসেছিলো রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মতো মনীষীরা। সতীদাহ প্রথা রোধ, নারী শিক্ষা কিংবা বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে এগিয়ে এসেছিলেন তারা। অতঃপর যতই দিন এগিয়েছে, সমাজসেবামূলক কাজের পরিধিও তত ব্যাপকতর হয়েছে। ১৯১২ সালে ডাঃ ডি চ্যাটার্জীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হলো Anti Malarial Society of Calcutta। ১৯১৫ সালে নিরক্ষরতা দূরীকরনের লক্ষে স্থাপিত হলো Bengal Social Service League। খরা, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে পীড়িতদের সেবায় গড়ে উঠলো সেবাসদন ও ভারত সেবাশ্রম সংঘের মতো সংস্থাগুলো। এছাড়া স্বদেশী আন্দোলন, গান্ধীবাদী আন্দোলনের সাথে বিজড়িত হয়েছিল সমাজসেবার আদর্শ। ১৯২০ সালে লন্ডনে খ্রীষ্টীয় চার্চগুলোর সমন্বয়ে গড়ে উঠলো Christian Aid, যা পরবর্তীতে দাতা সংস্থায় উন্নীত হয় এবং বর্তমানে ভারত-বাংলাদেশসহ অনেক উন্নয়নশীল দেশে এনজিওদের মূল দাতা-সংস্থা হিসেবে কাজ করছে।

সমাজের দুর্বল ও নিপীড়িত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় জনকল্যাণমূলক কাজের দীর্ঘ ঐতিহ্য সরকারী স্তরেও প্রভাব ফেলেছিল। ব্রিটিশ সরকারকেও ১৯২০ সালে সামাজিক সুরক্ষা আইন পাস করতে হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বিখ্যাত ডাচ দার্শনিক ডঃ সেফ হিউনিস সম্পাদিত বইতে এনজিও পরিচিতি সম্পর্কে বলা হয় এভাবে –

এনজিও শব্দটির জন্ম হয়েছে জার্মানী এবং হলান্ডে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে পশ্চিমা ধনী দেশগুলো বিশ্বের মধ্যে অসংখ্য গরীব দেশের সন্ধান পায়। এরপর এসব দেশের উন্নয়নকল্পে উন্নয়ন সাহায্যের সূত্রপাত ঘটায় সমাজে প্রচলিত 'উপঢৌকন রীতি' থেকে 'সাহায্য' নীতির জন্য। আর সংগঠনের মাধ্যমে সাহায্য আদান-প্রদান করনার্থে এনজিও সৃষ্টি।[১৭]

২য় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে মূলতঃ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর তত্ত্বাবধানে এনজিও কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। রোমান ক্যাথলিকরা ১৯৪৫ সালে CARE এবং ১৯৪৮ সালে OXFAM সৃষ্টি করেন। এমনকি হলান্ডের ধর্মনিরপেক্ষ এনজিও NOVIB এর প্রতিষ্ঠাতাও একজন চার্চ নেতা। এসব এনজিও তখন সীমিত আকারে তাদের কার্যক্রম চালিয়েছে। দরিদ্র দেশে কিছু কিছু আর্থিক অনুদান প্রদানই ছিল মূলতঃ তাদের কাজ। এই তহবিল তারা নিজেরাই সংগ্রহ করতো। এই অনুদান ছিল ত্রান ও কল্যাণমূলক কাজে সহায়তা করার জন্য। ৫০ এর দশকে গড়ে উঠে Community Based Organisation (CBO) যেমন: Salvation Army। ৬০ এর দশকে যেসরকারী পর্যায়ে উন্নয়ন প্রচেষ্টা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভের ক্ষেত্রে ব্যাপকতর অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। খৃষ্টীয় চার্চ প্রভাবিত সংস্থাগুলো এ সময় সাংগঠনিক দৃঢ়তা লাভ করে।

১৯৬৫ সালের পর থেকে পশ্চিমা এনজিওগুলোর কাজের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। শুধু ত্রানভিত্তিক কাজে সাহায্য না করে উন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে সাহায্য করার নীতি তারা অনুসরণ করা শুরু করে। এর পেছনে মূলত কাজ করে পশ্চিমা দেশের সরকারের দরিদ্র দেশে সাহায্য দান নীতির পরিবর্তন। এই সরকারগুলো তাদের দেশের এনজিওদের মাধ্যমে উন্নয়ন সাহায্য প্রদান শুরু করে। একে বলা হয় যৌথ অর্থ সাহায্য পদ্ধতি। অর্থাৎ পশ্চিমা দেশের এনজিওরা যে সাহায্য দরিদ্র দেশে দিচ্ছিল, সরকার তার সাথে আরো যোগান দেবে। হলান্ড ও জার্মানীর খৃষ্টান ডেমোক্রেটিক পার্টির সরকার এই নীতি চালু করেন।

ফ্রান্স ব্যতীত ইউরোপীয় কমিউনিটির দেশসমূহ এবং কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়াও এই পদ্ধতি অনুসরণ শুরু করে। এভাবে ধনী দেশের এনজিওরা সত্তর এর দশক পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

এই গতিধারায় উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এনজিও সংস্কৃতি গড়ে উঠে। অন্যদিকে '৭০ এর দশকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো সম্পর্কে সার্বিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়। বিশ্ব ব্যাংকের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মিঃ ম্যাকনামারা ঘোষণা করলেন, সরকারী স্তরে সাহায্যের পাশাপাশি সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোতেও সাহায্য করতে হবে। এদের মাধ্যমে তৃণমূল স্তরে সাহায্য পৌছাতে হবে Poorest of the poorদের কাছে।

---

[১৭] হামিদুল হক, স্বদেশে চিঠি, আইডিয়েল লাইব্রেরী, ঢাকা ১৯৯৩

Dhaka University Institutional Repository

এশীয়া মহাদেশের দেশগুলোতে স্বেচ্ছাসেবার দীর্ঘ ঐতিহ্যকে কাজে লাগিয়ে স্বার্থসিদ্ধিতে এগিয়ে এলো এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এর মতো সংস্থাগুলো। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ১৯৯৭ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল –

"It should not be forgotten that in Asian countries, there is a tradition of voluntary action for the upliftment of rural and urban poor, such as Sarvodaya or Gandhian Movement of India .... in many instances they are more effective in fulfil in the objectives of rural development than the bureaucratic organisations.

'৭০ এর দশকের মাঝামাঝি থেকেই বিদেশী সাহায্যদাতা সংস্থাগুলোর কর্মসূচীতে স্থান পায় দরিদ্র মানুষকে সংগঠিত করার ইস্যুটি। যেমন পশ্চিম জার্মানীর Action for World Solidarity.

বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রম

বাংলাদেশে মূলতঃ '৭০ এর দশক থেকেই এনজিও কার্যক্রমের ক্রমবিকাশ লক্ষ করা যায়। কারণ ত্রাণ ও সমাজকল্যাণধর্মী কার্যক্রমে এনজিও'দের সম্পৃক্ততার ইতিহাস অতি পুরাতন হলেও ১৯৭০ এর প্রলয়ংকরী ঘুর্নিঝড়ের পর থেকেই মূলতঃ বিদেশী এনজিওগুলো বিশেষ ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। স্থানীয় এনজিওগুলো সে সময় পারস্পরিক যোগাযোগের ভিত্তিতে বিদেশী এনজিও ও দাতা সংস্থাগুলোর কাছ থেকে ত্রান ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের জন্য সাহায্য সামগ্রী লাভ করতে শুরু করে। এছাড়া, ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর আওয়ামী লীগ সরকার যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের জনগণের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়, ফলে তাৎক্ষনিক প্রয়োজনেও জনগণের নিকট এনজিও'র সেবা কার্যক্রম গ্রহনযোগ্য হয়ে উঠে[১৮]।

সমসাময়িককালে ভারতে কংগ্রেস সরকার সেদেশে এনজিও কর্মকান্ডের সংকোচন নীতি অবলম্বন করায় অনেক এনজিও সে সময় ভারতে তাদের কার্যক্রম বন্ধ রেখে বাংলাদেশের দিকে অগ্রসর হয়।

'৮০ - এর দশক পর্যন্ত এনজিওদের তৎপরতা প্রধানত প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সুপ্ত ক্ষমতা বিকাশের মধ্যে সীমিত ছিল। এ দশকে বাংলাদেশের এনজিওরা দাতা সংস্থাগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করে যার ফলশ্রুতিতে দাতা সংস্থাগুলো বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে মোটা অংকের প্রকল্প সাহায্য দিতে এগিয়ে আসে। এনজিওদের চাপের মুখে বাংলাদেশ সরকারের The Foreign Contribution Regulation Ordinance 1982 শিথিল করা হয় এবং প্রচলিত পদ্ধতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটানো হয়। ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এনজিও সমূহের কার্যক্রমে সরকারী নীতি নির্ধারনের দায়িত্ব ছিল বহিঃসম্পদ বিভাগের। পরবর্তীতে ১৯৯০ সালের মে মাসে তৎকালীন রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের আওতাধীন এনজিও বিষয়ক ব্যুরো স্থাপন করা হয়। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাভূক্ত এই ব্যুরো এনজিও কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে সরকারী সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করে আসছে।

---

[১৮] হারুন অর রশীদ, বাংলাদেশে এনজিও, প্রগতি প্রকাশনা, ঢাকা ১৯৯৬ (পৃঃ ৬)

Dhaka University Institutional Repository

'৮০ এর দশকের শেষ দিক থেকে বাংলাদেশের এনজিওরা পরিবেশ, শান্তি, নারী উন্নয়ন, লিঙ্গ সমতা, বন্যা নিয়ন্ত্রন ইত্যাদি কাজে সম্পৃক্ত হয়। '৯০ - এর দশকের শুরু থেকেই বাংলাদেশের এনজিওগুলো সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে উন্নয়ন নীতি বিষয়ে তাদের অভিমত ব্যক্ত করতে সচেষ্ট ও সক্রিয় হতে থাকে। সরকার এনজিওদের সহযোগিতা ও পরামর্শনুযায়ী NEMAP (জাতীয় পরিবেশ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা) গ্রহণ করেছে।

১৯৯১ সালের জাতীয় নির্বাচনে কতিপয় এনজিও সীমিত আকারে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করলেও ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের সংসদ নির্বাচনে ফেয়ার ইলেকশন মনিটরিং এলায়েন্স (ফেমা) সহ ব্যাপক সংখ্যক এনজিও নির্বাচন পর্যবেক্ষণে সংশ্লিষ্ট হয়। অন্যদিকে মানবিক সাহায্য সংস্থাসহ বেশ কিছু এনজিও এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় তৃণমুল পর্যায়ে নাগরিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়ার বিকাশে সহযোগিতা করে।

'৯০-এর দশকে বাংলাদেশের রাজনীতির সাথে এনজিওদের একটি প্রভাবশালী অংশ জড়িয়ে পরে। ১৫ ফেব্রুয়ারী '৯৬ এর নির্বাচন বাতিলের দাবীতে অবস্থান নেয় এনজিওদের সমন্বয় সংস্থা এডাব।

নমুনা বিশ্লেষণ

আলোচ্য গবেষণা কাজে আশা ও মৌচাক নামক দুটো এনজিওকে নমুনা হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে।

Association for Social Advancement (ASA)

আশা ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সাল থেকে Association For Social Advancement (ASA) যাত্রা শুরু করে। অনগ্রসর জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য আশা এমন একটি উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ করে যেখানে গ্রামীণ জনগণ তাদের নিজেদের সমস্যা নিজেরাই চিহ্নিত করে সমাধানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর কাজের অভিজ্ঞতাও আশা'র প্রতিষ্ঠাতা এখানে প্রয়োগ করেছিলেন।

আশা'র স্বপ্নদ্রষ্টা শফিকুল হক চৌধুরীর সাথে যাত্রালগ্নে এই সংগঠনের হাল ধরেছিলেন ব্র্যাক ও সিসিডিবি নামক দুটো এনজিও থেকে পদত্যাগকারী কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

"আশা" উপকারভোগীদের জন্য আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচীর পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে। ইতোমধ্যে আশা বিশ্বের বৃহত্তম ও দ্রুত বিকাশমান একটি পূর্ণাঙ্গ আত্মনির্ভর ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

গত ২-৪ ফেব্রুয়ারী '৯৭ ওয়াশিংটন ডিসি'তে অনুষ্ঠিত ক্ষুদ্র ঋণ সম্মেলন থেকে ২০০০ সালের মধ্যে বিশ্বের ১০ কোটি পরিবারের ৬০ কোটি জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য নিরসনে যে কার্যক্রম নেয়া হয়েছে 'আশা' তার অন্যতম অংশীদার। 'আশা' ২০০৫ সালের মধ্যে ২০ লাখ পরিবারকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করছে যাতে বাংলাদেশের দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী ২০% জনগোষ্ঠী আশার উন্নয়ন অংশীদার হতে পারে।

'আশা'র টেকসই উন্নয়ন কৌশল

সংস্থার কার্যক্রমকে বাস্তবায়নের জন্য সহজ ব্যবস্থাপনা একটি অন্যতম উপাদান। সহজ ব্যবস্থাপনার জন্য আশা'র কাঠামোকে ছোট করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের উপর নির্ভরশীলতা কমানো হয়েছে। বিভিন্ন স্তরে ব্যবস্থাপনাকে সহজকরণের মাধ্যমে প্রশাসনিক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। স্বল্প সময়ের নোটিসে মাঠ পর্যায় থেকে কর্মী নিয়োগ, কম সময়ে Field orientation ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, কর্মীভিত্তিক দৈনিক জবাবদিহিতা, দিনের কাজ দিনে সম্পাদন, একজন মাঠকর্মীর সক্ষমতা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন এবং কর্মীদের অফিসে থাকা-খাওয়ার বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান ইত্যাদি।

ন্যূনতম ব্যয় ও কম সময়ে আয়-ব্যয়ের সমতা ঃ আশা একটি ইউনিট কার্যালয় খোলার প্রথম ৩ মাসের মধ্যে ইউনিট লক্ষ্যস্থিত (Target Group) ১২০০-১৪৪০ জন সদস্যকে সমিতিভূক্ত করে এবং ইউনিট শুরু থেকে ৬ মাসের মধ্যে সকল সদস্যকে ঋণের আওতায় আনা হয় এবং শুরু থেকে ৯-১২ মাসের মধ্যে ইউনিটের যাবতীয় ব্যয়ের সমতায় (Break-even) পৌছানো সম্ভব হয়। সংস্থার যে সমস্ত ব্যয় আছে তাকে সীমিত রাখার জন্য বিভিন্ন ব্যয়ের খাতসমূহের সর্বোচ্চ সিলিং বেধে দেয়া এবং সংস্থার সমুদয় আসবাবপত্রের নমুনা, ডিজাইন বাজেটসহ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়।

ইউনিট থেকে কেন্দ্রীয় অফিস পর্যায়ে সমুদয় ব্যয় সদস্যদের সেবাদানের মাধ্যমে তাদের থেকে অর্জিত সেবামূল্য হিসাবে সার্ভিস চার্জ থেকে মেটানো সম্ভব হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ইউনিট থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অর্থাৎ সকল স্তরে সকল প্রকার বাহুল্য ব্যয় এড়িয়ে চলার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আরো উল্লেখ্য যে, Regional Manager (R.M) থেকে Zonal Manager (Z.M)পর্যায়ে আলাদা কোন অফিস না থাকায় অনেক ব্যয় কমানো সম্ভব হচ্ছে।

বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থাপনা ক্ষমতা সর্বনিম্ন স্তরে হস্তান্তর ঃ সংস্থার সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থাপনার সমুদয় ক্ষমতা ইউনিট পর্যায়ে হস্তান্তর করা হয়েছে। ইউনিট হচ্ছে সংস্থার কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তর। এ ইউনিট থেকেই ঋণ অনুমোদন, সংস্থার হিসাব পরিচালনা, রেকর্ড-পত্র সংরক্ষণ, বেতন-ভাতাসহ যাবতীয় ব্যয়ের অনুমোদন, কর্মীদের প্রশিক্ষণসহ খাওয়ার ব্যবস্থা, 'আশা'র লিখিত ম্যানুয়েল সার্কুলার অনুসরণে যাবতীয় কাজ স্বাধীন ও বাধা বিপত্তিবিহীনভাবে সম্পাদন করা হয়। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শন, ফলো-আপ, গতীয় মনিটরিং এবং নিরীক্ষণ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঘূর্ণায়মান তহবিলের সর্বোচ্চ ব্যবহার : কম মূলধনে অধিক সদস্যকে ঋণের আওতায় আনা এবং মূল তহবিলকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে Revolving করানোর উপর টেকসই উন্নয়ন নির্ভরশীল। 'আশা' তহবিলের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নেয়ার জন্য যে সকল পদক্ষেপ নিয়েছে তা নীচে বর্ণিত হলোঃ

প্রতি মাসে ১-৫ তারিখের মধ্যে অঞ্চলের সকল ইউনিট ম্যানেজারদের নিয়ে মাসিক সমন্বয় সভায় প্রতি ইউনিটের তহবিলের অবস্থা বুঝে এক ইউনিট থেকে অন্য ইউনিটে তহবিল স্থানান্তর করা হয়। দৈনিক আদায়কৃত টাকা নগদ বিতরণ, এক মাস আগে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তহবিলের চাহিদা প্রেরণ, দুই মাস ব্যবহার হবে না এমন যে কোন অঙ্কের টাকা এসটিডি-তে স্থানান্তরের ঝামেলা দ্রুত স্থানান্তর, ব্যয় বাঁচানোর জন্য ইউনিট টু ইউনিটে নগদ টাকা স্থানান্তর, তহবিল ব্যবস্থাপনাকে নিয়মিত ফলো-আপে রাখা, ব্যাংক সুদ দিলো কি না-তার হিসাব রাখা, ব্যাংকের হিসাব পরিচালনার জন্য কমিউনিটি অর্গানাইজার (সি.ও)এবং ইউনিট ম্যানেজারকে স্বাক্ষরকারী হিসাবে রাখা হয় এবং স্বাক্ষরকারী পরিবর্তনের ক্ষমতা প্রধান নির্বাহী থেকে আরএম/জুঃ আরএম পর্যায়ে অর্পণ, সদস্যদের সঞ্চয়কে ঋণ তহবিল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। দৈনিক সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা উত্তোলনের ক্ষমতা অর্পণ, প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে পরবর্তী বছরের তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্য অগ্রিম পরিকল্পনা এবং মাস/সাপ্তাহ ভিত্তিক তহবিল ব্যবস্থাপনা রিভিউকরণ করার নিয়ম অনুসরণ করা হয়।

সহজ হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি : প্রত্যেক ঋণ গ্রহীতার জন্য আলাদা আলাদা পাতায় হিসাব না খুলে একটি পাতায় একটি সমিতির ২০-৩০ সদস্য / সদস্যার সঞ্চয় ও ঋণের হিসাব রাখা হয়। একজন সি.ও (মাঠ কর্মী) ১৫-২০টি সমিতির যাবতীয় হিসাব ১টি মাত্র রেজিষ্টারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়া কালেকশন সীটের পরিবর্তে কালেকশন রেজিষ্টার চালু রাখা, কলামভিত্তিক নগদান খাতা, ইউনিট অফিসে দৈনিক ভিত্তিক ১টি কালেকশন সীট ব্যবহার, এরূপ সহজ পদ্ধতির হিসাবের কারণে একজন কর্মীকে হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে দৈনিক সময় ব্যয় করতে হয় মাত্র ২০-৩০ মিঃ। ফলে কর্মীদের পক্ষে মোটিভেশনের কাজে মাঠ পরিদর্শন ও প্রকল্প ফলো-আপে অধিক সময় ব্যয় করা সম্ভব হয়।

স্বচ্ছতার ও জবাবদিহিতার অংশ হিসেবে প্রতিদিন কর্মীদের ফিল্ডে যাওয়ার আগে ব্লাক বোর্ডে ও কালেকশন সীটে আদায়যোগ্য টাকার পরিমান লিখে যেতে হয়, যা সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকে। দৈনিকভিত্তিক অনাদায়ী Calculation হওয়ায় কর্মীরা লুকোচুরি করার সুযোগ পায় না। মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মীগণের নিজেদের মধ্যে অবৈধ কোন আঁতাত করার সুযোগ নেই। বহিরাগত যে কোন পর্যায়ের পরিদর্শকের সমস্ত রেকর্ডপত্রসহ মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের জন্য পূর্ব অনুমোদনের দরকার হয় না। বহিরাগতদের জন্য পরিদর্শন উন্মুক্ত করে দেয়ার বিষয়টি পত্র-পত্রিকা মারফত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। এছাড়া হিসাব পদ্ধতি এমনভাবে সহজ করা আছে যে, চোখের পলকে কম সময়ে সঞ্চয় ও ঋণের আদায়, অনাদায় বুঝা যায়।

সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক স্তর : এ প্রকল্পের ইউনিটই হচ্ছে সমস্ত কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু। যেখানে ১ জন ইউএম, ১ জন ইউও এবং ৩-৫ জন সিও (মাঠ কর্মী)

Dhaka University Institutional Repository

নিয়োজিত থাকেন। একটি অফিসের আওতায় স্বল্পসংখ্যক কর্মী থাকায় সবকিছু ম্যানেজ করা সহজ হয়। কর্মীদের মধ্যে খোলামেলা আলোচনার সুযোগ থাকে, আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়, তা থেকে একটা টীম স্পীড গড়ে উঠে। দলাদলি, ফোন্দল এবং পারস্পরিক অসন্তোষ গড়ে উঠার সুযোগ থাকে সীমিত। জুঃ আরএম, আরএম যারা অঞ্চলের দায়িত্ব পালন করে, সিঃআরএম এবং জেডএম যারা জোনের/বৃহত্তম অঞ্চলের দায়িত্ব পালন করেন তাদের জন্য আলাদা কোন অফিস/সেক্রেটারীয়েট থাকে না। তারা সব সময় ইউনিট থেকে ইউনিট, অঞ্চল থেকে অঞ্চলে ভ্রাম্যমান পরিদর্শনে থাকেন। প্রশাসনিক বা অন্য কোন প্রয়োজনে ইউনিট থেকে তাদের কাছে কেউ আসবে না। বরং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সপ্তাহের মধ্যে পরিকল্পনামাফিক তাদের কাছে চলে যান। সমগ্র 'আশা'র কর্মএলাকাকে ৫টি বিভাগে ভাগ করে প্রতিটি বিভাগের মধ্যবর্তী স্থানে সৃষ্টি করা হয়েছে ডিভিশনাল ফোকাল সেন্টার। যার প্রতিটি বিভাগের দায়িত্বে থাকেন একটি টীম।এর নেতৃত্বে থাকেন পি.সি পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা।

সর্বোচ্চ ঋণ আদায়ের হার ঃ ঋণ কার্যক্রমের সাফল্য, ব্যর্থতা, টেকসই ও স্থায়িত্ব- সবকিছুই নির্ভর করে ঋণ আদায়ের সর্বোচ্চ হারের উপর। আশা'র ঋণ আদায়ের হার প্রায় ৯৯% । এ হার বিশ্বের সকল বৃহত্তর ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান গুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। এ উচ্চ ঋণ আদায়ের কারণ হলো - সঠিক ঋণ গ্রহীতা নির্বাচন, দেখে-শুনে ঋণ দেয়া এবং স্কীমের যথাযথ বাস্তবায়ন ও ফলো-আপ, কর্মীদের আন্তরিকতা ও লেগে থাকার মানসিকতা, গভীর মনিটরিং, সদস্যদের সাথে কর্মীদের আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ, কথা ও কাজে মিল থাকা, সদস্যদের চাহিদা মতো নির্দিষ্ট সময়ে ঋণের সরবরাহ ইত্যাদি।

সঞ্চয়ের মাধ্যমে ঘূর্ণায়মান তহবিল সৃষ্টি ঃ টেকসই উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য তহবিলের উৎস একটি বড় বিষয়। মূলধনের জন্য অতিমাত্রায় দাতার উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে বিকল্প মূলধন সৃষ্টি একমাত্র সদস্যদের সঞ্চয়ের মাধ্যমে সম্ভব। এর জন্য দরকার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস। আশা এই আস্থা অর্জনে সক্ষমতা অর্জন করেছে। ফলে সদস্যরা জুন '৯৭ পর্যন্ত প্রায় ৬০ কোটি টাকা ঋণ তহবিলে জমা রেখেছে, যা দিয়ে অনেক বেশি সদস্যকে ঋণ সেবার আওতায় আনা সম্ভবপর হয়েছে। আশা এ সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রায় ৮% সুদ দিচ্ছে।

মনিটরিং ঃ সংস্থার কাজের গতিপ্রকৃতি, পরিমাণ, নিয়মনীতি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য বিভিন্ন স্তরে মনিটরিং পদ্ধতি সাজানো হয়েছে এবং সমিতি, ইউনিট, অঞ্চল ও জোন পর্যায়ে সকল প্রকার তথ্য সংরক্ষণ এবং কাজের মান নির্ণায়ক বিষয়ে চেকলিষ্ট করা আছে, যাকে অনুসরণ করে মনিটরিং করানো হয়। এছাড়া জোন/বৃহত্তর অঞ্চল পর্যায়ে প্রায় ২০ জন এবং কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রায় ৫ জন Internal Auditor দ্বারা সংস্থার মাঠ পর্যায়ের ১০০% হিসাব অডিট করানো হচ্ছে।

দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ সংস্থার কাজকে গতিশীল রাখার জন্য এবং মাঠ পর্যায়ে চিহ্নিত সমস্যাবলীর দ্রুত সমাধানের জন্য 'আশা' সর্বদা গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এজন্য বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের নিয়ে সমন্বয় সভার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের অংশগ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

নিশ্চিত করে থাকে। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়ন, পরিদর্শন ও মনিটরিং কাজে নিয়োজিত সমন্বয় বিভাগের ও অডিট বিভাগের প্রায় ২০ জন কর্মী প্রতি মাসে ১০-১৫ দিন পরিদর্শন কাজে ব্যস্ত থাকেন। ফলে প্রতি মাসে প্রায় ১০০ ইউনিট (২০%) পরিদর্শন হয়। এর উপর বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনের উপর গৃহীত সিদ্ধান্তবলী দ্রুত মাঠে প্রেরণ করা হয়।

চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে সংস্থার নিয়মনীতি পরিবর্তনের সহজ পদ্ধতি ঃ

সময় ও অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে সংস্থার নিয়মনীতি পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজনের জন্য দীর্ঘ সময় ও সকল প্রকার জটিলতা এড়িয়ে চলা হয়। কোন নিয়মনীতি বাস্তবতার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হলে তাৎক্ষণিক তা সংশোধন করে সময়োপযোগী নীতিমালা প্রণীত হয়। ইতিপূর্বে যে সকল নিয়মনীতির পরিবর্তন করা হয়েছে তন্মধ্যে সার্ভিস চার্জ ১৫% থেকে ১২.৫%, প্রথম ঋণের সিলিং ২০০০ থেকে ৪০০০ টাকা, মাঠ পর্যায়ে সকল প্রকার ব্যয়ের অনুমোদন ক্ষমতা আর,এম থেকে ইউ,এম পর্যায়ে হস্তান্তর, ব্যাংক হিসাব পরিচালনাকারীর স্বাক্ষর পরিবর্তন করার ক্ষমতা প্রধান নির্বাহী থেকে আর,এম/জুঃআর এম পর্যায়ে হস্তান্তর ইত্যাদি।

ডিসেম্বর' ১৯৯৮ পর্যন্ত আশা'র অর্জন

৬১টি জেলায় ৩৬০টি থানায় ১৩৫৪২ টি গ্রামে ৮৯৪,১১৯ জন সমিতির সদস্যকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হয়েছে । ৭৮৬,৪৯২ জন সমিতির সদস্যের মধ্যে ১৩,১৮৩.৪৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। দলীয় সঞ্চয়ের পরিমান দাড়িয়েছে ১০৮১.০৭ মিলিয়ন টাকা। ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে ৯৩.৪১% মহিলা।

এছাড়া 'আশা' জাতীয়করণকৃত বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ০৯% সুদে ফেরৎযোগ্য ঋণ গ্রহণ করে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য তহবিল সংগ্রহ করে কাজ করছে। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আশা'কে ৫% সুদে ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান করা হচ্ছে।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নিয়ে আশার উন্নয়ন প্রচেষ্টার ধারাবাহিক অগ্রগতিকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় ঃ

* Foundation Phase (১৯৭৮-১৯৮৪)
* Transition Phase (১৯৮৫-১৯৯১)
* Program Specialisation Phase (১৯৯২- বর্তমান পর্যন্ত)

১ম পর্বের ৭ বছর আশা 'সমিতি' গঠনের মাধ্যমে জনগণকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করেছে। এ পর্বের অন্যতম কর্মসূচী ছিল -

ক) সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি
খ) আইনগত অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো
গ) সাংগঠনিক ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ
ঘ) যোগাযোগ কাজে সহযোগিতা
ঙ) গ্রামীণ সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

382770

Dhaka University Institutional Repository

এ সময়ে আশা ২৭টি থানাতে ৫০,০০০ সদস্য নিয়ে ৪০০০ সমিতি গড়ে তোলে। এ পর্বের কাজের সফলতা হচ্ছে।

ক) ভূমির উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা

খ) প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদের উপর নিজের অধিকার নিশ্চিতকরণ

গ) আইনগত অধিকার সুরক্ষা এবং স্থানীয় এলিটদের চ্যালেঞ্জ

ঘ) প্রকৃত মজুরী আদায়

ঙ) স্থানীয় সরকার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ।

২য় পর্বের কাজ

* উন্নয়ন শিক্ষা
* মানব সম্পদ প্রশিক্ষণ
* স্বাস্থ্য সেবা প্রদান
* ক্ষুদ্র সেচ
* দুর্যোগ- পরবর্তী পুনর্বাসন কর্মসূচী
* নারী উন্নয়ন কর্মসূচী।

২য় পর্বের কাজের সফলতা

১। মৌলিক স্বাক্ষরতা কর্মসূচীর কারণে সমিতির তৎপরতা বৃদ্ধি

২। আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের কারণে কৃষি ও অকৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি

৩। মহিলাদের গৃহস্থালী ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ

৪। যান্ত্রিক সেচের কারণে উৎপাদন ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ

বর্তমান পর্ব (১৯৯২- অব্যাহত)

এই পর্বে আশা সমিতি গঠন প্রক্রিয়ায় নতুন কৌশল অবলম্বন করছে। পুরুষ সমিতিগুলো বিলুপ্ত করে সেসব সদস্যের স্ত্রীদের নিয়ে সমিতি গঠন করা হয়। এই কৌশলের প্রেক্ষিতে ১৯৯৫ সালের নভেম্বর মাসে 'আশা' কর্তৃক সংগঠিত মহিলা সদস্যের সংখ্যা ৩৭৬৮০১ জন এবং পুরুষ সদস্য সংখ্যা ছিল ২০০৩ জন। '৮০ এর দশকের অভিজ্ঞতার আলোকে 'আশা' দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ৯০-এর দশকের শুরু হতে ঋণ প্রদান কার্যক্রম শুরু করে।

Dhaka University Institutional Repository

আশা - এক দৃষ্টিতে

(ডিসেম্বর ১৯৯৮ পর্যন্ত)

১)	সমিতি সদস্য	৮,৯৪,১১৯ জন
২)	ঋণ গ্রহনকারী	৭,৮৬,৪৯২ জন
৩)	উন্নয়ন শিক্ষা কেন্দ্র	২৪৬৩৫ টি
৪)	উন্নয়ন শিক্ষার্থী	৪৭৬২৭৪ জন
৫)	স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন সমিতি সদস্য	৪৭৬২৭৪ জন
৬)	বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	১৩,১৮৩,৪৬মিলিয়ন টাকা
৭)	আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ	১০,৬৮৭,৭৭ মিলিয়ন টাকা
৮)	ইউনিট অফিস	৭৩২ টি
৯)	কর্মী সংখ্যা	৩৩৩৫ জন
১০)	কর্ম এলাকায় থানার সংখ্যা	৩৬০ টি
১১)	ইউনিয়ন	২৫৬২ টি
১২)	গ্রাম	১৩৫৪২ টি
১৩)	জেলার সংখ্যা	৬১ টি
১৪)	ঋণ আদায়ের হার	৯৯.৯৬%

উৎস : ASA Sustainable Micro Finance Model, 1996.

ASA at a glance, 1998.

ক্ষুদ্র ঋন কর্মসূচীর তহবিলের উৎস

১)	দাতা সংস্থার মঞ্জুরী	৫৬৮,৪১৯,৮৯৪	১৯.৫৬%
২)	সমিতি সদস্যদের সঞ্চয়	১,০৮১,০৬৬,৭০৯	৩৭.২১%
৩)	পিকেএসএফ	৭০০,৫০০,০০০	২৪.১১%
৪)	অন্যান্য	৫৫৫,৩২৬,৮৪২	১৯.১১%
	মোট	২,৯০৫,৩১৩,৪৪৫	১০০.০০%

উৎস : ASA at a glance, 1998. Page - 4

Dhaka University Institutional Repository

উপকারভোগীদের প্রকৃতি

মাসিক আয় ১৫০০ টাকার উর্ধ্বে নয়, এমন দরিদ্র জনগণ নিয়ে সমিতি গঠন করা হয়। মূলতঃ মহিলারাই এসব সমিতির সদস্য। সমিতিতে সংগঠিত সদস্যদেরকে অনানুষ্ঠানিকভাবে নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে ঃ

ক) ক্ষমতায়নের জন্য শিক্ষা

খ) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড

গ) প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য জ্ঞান ও পুষ্টি শিক্ষা

ঘ) সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন গঠন

ঙ) পরিচ্ছন্নতা, টিকাদান এবং স্যানিটেশন বিষয়ে জ্ঞানদান

দারিদ্র্য বিমোচনে আশা'র কার্যক্রম

জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ করার লক্ষে ১৯৯২ সাল থেকে আশা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, গৃহায়ন, আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড, স্যানিটেশন এবং পরিবেশ বিষয়ে সম্পুরক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে।

কর্মসূচীসমূহের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

ক্ষমতায়নের জন্য শিক্ষা ঃ আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিই আশা'র উন্নয়ন শিক্ষার লক্ষ্য। নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করার জন্য আশা 'অনুঘটক' এর ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করতেই আশা'র এই কর্মসূচী।

শিক্ষা কর্মসূচীর লক্ষ্য

- স্বাক্ষরতা কার্যক্রমের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন
- লেখা পড়া ও নাম স্বাক্ষর করার সক্ষমতা সৃষ্টি করা
- দারিদ্র্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং দরিদ্রতার কারণ অনুসন্ধানের সামর্থ্য
- সরকারী সেবা সম্পর্কে অবহিত করা
- জীবনের প্রতি সৃষ্ট হতাশা দূর করা

কর্মকৌশল

- শিক্ষা ক্লাশ নেয়ার জন্য ২০ জনের একটি দল গঠন করা
- একজন কর্মী সপ্তাহে একটি ক্লাশ নিয়ে থাকেন।
- ক্লাশে অংশগ্রহণকারীরা সমাজে অন্যায়, নির্যাতন, প্রতারণা, শোষণ, সঞ্চয়, রোগ-ব্যাধি এবং খাদ্য পুষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন।
- পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সম্ভাব্য সমাধান ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন

'আশা' প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় বিশ্বাস করে, যাতে অংশ গ্রহণকারীরা নিজেদেরকে উপস্থাপন করতে পারে। অংশগ্রহণমূলক প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশ্ন করার সুযোগ পায়। এই প্রক্রিয়ায় একজন অংশগ্রহণকারী শুধু শ্রোতা নয়, বক্তাও বটে। এ ধরনের প্রশিক্ষণের মূল টার্গেট প্রশিক্ষক নয়, প্রশিক্ষণার্থী। এ ধরনের পরিবেশ প্রশিক্ষাণার্থীকে নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উৎসাহী করে তোলে। মূলতঃ ক্ষমতায়নের দৃষ্টিভঙ্গিতেই প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়ে থাকে।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয় এবং নাগরিক অধিকার ও সামাজিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধি সম্প্রসারিত হয়।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতাবৃদ্ধির ফলে তৃণমূল পর্যায়ের জনগনের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণে সামর্থ্য বৃদ্ধি, সংঘাত নিরসন, কর্মসূচী ব্যবস্থাপনা, নেতৃত্বের উন্নয়ন, উন্নয়ন শিক্ষা এবং সচেতনতাবৃদ্ধি কার্যক্রমে সফলতার পরিচয় দিতে পারে।

প্রশিক্ষণের লক্ষ্যসমূহ

⇒ তৃণমূল পর্যায়ে কর্মরত কর্মীদেরকে প্রশিক্ষিত করে তোলা, যাতে তারা মানব সম্পদ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

⇒ সমিতির নেতাদেরকে নেতৃত্বের যোগ্যতার্জনে সহায়তা করা।

⇒ সমাজে শোষণের চিত্র সম্পর্কে ভূমিহীনদের সচেতন করে তোলা এবং এই পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য তাদের মধ্যে সৃজনশীল ক্ষমতা সৃষ্টি করা।

⇒ টার্গেটকৃত দলের নেতৃত্বের দক্ষতা উন্নয়ন করা, যাতে তারা কার্যকরীভাবে তাদের সমিতির সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে।

⇒ সমিতি সদস্যদের ব্যবস্থাপনা ও পেশাগত দক্ষতা বাড়ানো, যাতে তারা আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে।

⇒ অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় কাজ করার জন্য আশা'র কর্মীদেরকে ইপ্সিত দক্ষতার্জনে সহায়তা করার মাধ্যমে তাদের অধিকতর সাফল্যের জন্য ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ এবং নেতৃত্বের গুনাবলী উন্নয়ন করা।

কৌশলসমূহ

⇒ ভূমিহীন সমিতি সদস্য এবং আশা'র ষ্টাফদেরকে প্রশিক্ষিত করে তোলা।

⇒ কেন্দ্রে এবং স্থানীয় পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ দেয়া।

⇒ নিয়মিত সমিতি বৈঠকের মাধ্যমে সমিতি সদস্যদেরকে প্রশিক্ষিত করে তোলা।

ক্ষমতায়নের লক্ষে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী

তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নতির প্রত্যাশায় স্থানীয় মহাজনদের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা পরিহার করে সহজ নিয়মকানুনের ভিত্তিতে ঋণ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করাই জন্যই আশা'র আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

ঋণ গ্রহীতারা ক্ষুদ্র ব্যবসা, গৃহস্থালী উৎপাদন এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কাজে ঋণ ব্যবহার করে টাকা আয় করে। ফলে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় এবং শহরমুখী প্রবনতা হ্রাস পায়। আশা'র ঋণগ্রহীতারা ক্রমান্বয়ে স্থানীয় মহাজন ও ভূ-স্বামীদের উপর তাদের নির্ভরশীলতা হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছেন। বেশ কয়েকটি ঘটনা সমীক্ষা থেকে প্রমান পাওয়া যায় যে, ঋণ পরিশোধের পরও তারা মূলধনের সমপরিমাণ অর্থ বাড়তি আয় করেছেন।

সাপ্তাহিক সঞ্চয় এবং কিস্তি পরিশোধের ফলে ঋণ গ্রহীতারা একটি সুশৃংখল জীবন গড়ে তোলেন। এ ধরনের বিকল্প অর্থ ব্যবহার কারণে সমিতি সদস্যদের মধ্যে এক ধরনের আত্মবিশ্বাস ও সংহতি গড়ে উঠে যা তাদের জীবনযাত্রার গুনগত মানোন্নয়নে সহায়ক।

কর্মকৌশল

⇒ সমিতি গঠনের পর শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে সদস্যদেরকে ঋণ দেয়া হয়

⇒ সাপ্তাহিক কিস্তিতে ঋণ আদায় করা হয়

⇒ সপ্তাহে ৪ টাকা হারে সঞ্চয় করতে হয়

ঋণ প্রদান নীতিমালা এবং প্রক্রিয়া

⇒ একজন সমিতি সদস্য যিনি ছয়মাস পর্যন্ত সাপ্তাহিক সভায় নিয়মিত উপস্থিত ছিলেন এবং যার সঞ্চয় নিয়মিত, তিনি ঋণ পাবার যোগ্য।

⇒ একজন সমিতি সদস্য, যিনি নিয়মিতভাবে কিস্তিতে ঋণ পরিশোধে বিশ্বস্ততা অর্জন করেছেন, তিনি পুনরায় ঋণ পাবার যোগ্য।

⇒ সমিতির সদস্যগণ যারা ঋণের টাকার পরিমানের ১০%-১৫% সঞ্চয় করতে সক্ষম তারা ঋণ পেয়ে থাকেন।

⇒ ঋণ বিতরণের আগে তৃণমূল পর্যায়ে কর্মরত কর্মীদের দ্বারা একটি Feasibility Study করা হয়ে থাকে।

⇒ ঋণ গ্রহণে আগ্রহী সমিতি সদস্যকে তার সমিতি কমিটির সুপারিশপত্র পেশ করতে হয়।

⇒ ঋণ গ্রহণের সাথে সাথেই বিনিয়োগ করতে সক্ষম ব্যক্তিকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে 'আশা' অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

ঋণ আদায় প্রক্রিয়া

⇒ সমিতি সদস্যরা সাপ্তাহিক সভায় সবার উপস্থিতিতে কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করে।

⇒ সমিতি নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে ইউনিট সুপারভাইজার কিস্তির টাকা সংগ্রহ করেন এবং সভার আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

⇒ একজন ইউনিট সুপারভাইজার ১০টি সমিতির ঋণ আদায় এবং একই দিনে সেই টাকা ব্যাংকে ডিপোজিট করার দায়িত্ব পালন করেন।

⇒ একজন এলাকা তত্ত্বাবধায়ক পাঁচজন ইউনিট সুপারভাইজারের কাজ তত্ত্বাবধান করেন।

আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নানাবিধ অসুবিধা সৃষ্টি হয় যেগুলো কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাদের নিরীক্ষা এবং মাঠকর্মী ও সমিতি নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় সমাধান করা হয়।

সঞ্চয় কার্যক্রম

আশা সমিতি সদস্য ও সদস্য নয় এমন লোকদের মধ্যে তৃণমূল পর্যায়ে সঞ্চয়ী মনোভাব সৃষ্টি করতে সচেষ্ট। স্থানীয় সম্পদ সৃষ্টি এবং সদস্যদের সম্পদের পরিমাণ বাড়াতে সঞ্চয় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। আশা নিম্নোক্ত উপায়ে জনগোষ্ঠীকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করে তহবিল গড়ে তোলে।

ক) সাপ্তাহিক সঞ্চয় ঃ সমিতি সদস্যরা তাদের নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী সপ্তাহে ১০ বা ২০ টাকা হারে সঞ্চয় করে থাকে।

খ) স্বেচ্ছায় সঞ্চয় ঃ সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের বাইরে আশা সদস্যরা অথবা কর্ম এলাকার অন্য যে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ বা নারী যে কোন পরিমাণ টাকা সঞ্চয় করতে পারে।

গ) দীর্ঘ মেয়াদী সঞ্চয় ঃ এই প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ মেয়াদে মাসিক কিস্তিতে আশার নিকট সঞ্চয় জমা রাখা যায়।

ঘ মেয়াদী সঞ্চয় ঃ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এই প্রক্রিয়ায় আশার নিকট সঞ্চয়ের টাকা রাখা যায়। যেমন - কেউ পাঁচ হাজার টাকা ৫ বছরের জন্য সঞ্চয় করতে পারেন।

ডিসেম্বর ১৯৯৮ পর্যন্ত সঞ্চয়ের পরিমান

	সঞ্চয়ের প্রকারভেদ	টাকার পরিমাণ
ক)	সাপ্তাহিক সঞ্চয়	৬০৬,৬৬৩,০২১
খ)	স্বেচ্ছায় সঞ্চয়	২০৯,৬৯৭,৮৮৬
গ)	দীর্ঘ মেয়াদী সঞ্চয়	১৩১,৪৪৩,০৯৯
ঘ)	মেয়াদী সঞ্চয়	১৯,২০৮,০০০
	মোট	টাঃ ১,০৮১,০৬৬,৭০৯

Dhaka University Institutional Repository

সমন্বিত স্বাস্থ্য কর্মসূচী

লক্ষ্যসমূহ ঃ

ক) কর্মসূচী পরিচালনার জন্য সুপারভাইজার এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষিত করে তোলা।

খ) ক্লিনিকের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণকে চিকিৎসা সুবিধা দেয়া।

গ) ধাত্রীদের প্রশিক্ষিত করে তোলা যাতে তারা নিরাপদ প্রসবে সহযোগিতা করতে পারেন।

ঘ) সাধারণ রোগসমূহের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে তৃণমূল পর্যায়ের জনগণকে অবহিত করা।

ঙ) পুষ্টিজ্ঞান বাড়ানো।

চ) স্থানীয় ক্লিনিকে অসুস্থ রোগীর চিকিৎসা করা এবং জটিল রোগের ক্ষেত্রে থানা হাসপাতালে Refer করা।

কর্মকৌশল ঃ

স্বাস্থ্যকর্মীগণ সমিতির সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিত হয়ে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিজ্ঞান সম্পর্কে সমিতি সদস্যদের সাথে কথা বলেন। স্থানীয়ভাবে চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ ও উপকরণ ক্লিনিকে রাখা হয়। গর্ভবতী মায়েদের পরিচর্যা সেবাও দেয়া হয়। এ ছাড়া অন্যান্য সেবার মধ্যে রয়েছে-

⇒ সয়কার এবং ইউনিসেফের সহযোগিতায় টিকাদান কর্মসূচী বাস্তবায়ন

⇒ একটি পল্লী ক্লিনিকে একজন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সুপারভাইজার এবং ৫ জন স্বাস্থ্য সহকারীর স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিম্নোক্ত কর্মসূচী পরিচালিত হয়ে আসছে -

⇒ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও প্রশিক্ষণ

⇒ ভূমিহীন কৃষকদের জন্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা প্রশিক্ষণ

⇒ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ক্লিনিক

⇒ টিবিএ প্রশিক্ষণ

⇒ টিকাদান কর্মসূচী

⇒ চক্ষুদৃষ্টি পরীক্ষা

⇒ সব্জী বীজ ও চারা বিতরণ

⇒ টিউবওয়েল বসিয়ে দেয়া

⇒ স্বল্প মূল্যে সেনিটেশন সুবিধা প্রদান

⇒ পুষ্টি পরিস্থিতি মনিটরিং

⇒ খাদ্য রান্না প্রদর্শনী

Dhaka University Institutional Repository

আশা ও লোকাল এনজিও পার্টনারশীপ প্রোগ্রাম

১৯৯৫ সাল থেকে আশা তৃণমূল পর্যায়ে কর্মরত ছোট আকারের এনজিওদের সাথে অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে কাজ করছে। বার্ষিক ৭% হারে সুদের ভিত্তিতে আশা তার পার্টনার এনজিওদেরকে ক্ষুদ্র ঋণের জন্য ফেরতযোগ্য অর্থ তহবিল দিয়ে থাকে। এছাড়া পার্টনার এনজিওগুলো আশা থেকে কারিগরী সহায়তাও পেয়ে থাকে। এ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হচ্ছে- অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং দুর্গম এলাকায় ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে টেকসই উন্নয়নে সহায়তা করা। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এই চার বছরে আশা ১৬টি পার্টনার এনজিওকে ২৭৫৫ মিলিয়ন টাকার তহবিল দিয়েছে। এসব এনজিও এ পর্যন্ত ১৯০১টি সমিতির মাধ্যমে ৩৫৩৯২ জন নারী-পুরুষকে সংগঠিত করে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করেছে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আশা'র মডেল অনুসরণ

বাংলাদেশে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে আশা'র ক্ষুদ্র ঋণের সফলতার প্রেক্ষিতে বিশ্বের আরো কয়েকটি দেশে আশা'র উন্নয়ন মডেল অনুসরণ করা হয়। জর্ডান, তাজাকিস্তান, ফিলিপাইন ও ভারতের বিভিন্ন এলাকায় আশা'র মডেল অনুসরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আশা'র কর্মকর্তারা এসব দেশে বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করছেন।

ফুলগাজী এলাকার দারিদ্র্য পরিস্থিতি ও আশা'র কার্যক্রম

১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর থেকে আশা ফুলগাজীতে কাজ শুরু করে। ফুলগাজী বাজারে একটি দোতলা ভবনের একটি কক্ষ ভাড়া নিয়ে অফিসের কাজ শুরু হয়। প্রথম দিকে শুধু ফুলগাজী ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামে কার্যক্রম শুরু হলেও অক্টোবর '৯৮ পর্যন্ত পরশুরাম থানার মোট ১৯টি ইউনিয়নের মধ্যে ০৫টি ইউনিয়নের ৩৮টি গ্রামে আশা'র তৎপরতা সম্প্রসারিত হয়েছে।

এ পর্যন্ত আশা'র ফুলগাজী ইউনিটে মোট ৯২টি সমিতি সংগঠিত হয়েছে, তন্মধ্যে ২০টি সমিতির সকল সদস্য পুরুষ, অন্যদিকে বাকী ৭২টি মহিলা সমিতি। গ্রামের অগ্রসর, দরিদ্র ও ভূমিহীন মহিলারা এসব সমিতি গঠন করেছে। সমিতির সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে সমিতির সভানেত্রী, সম্পাদিকা এবং কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

৭২টি মহিলা সমিতিতে মোট সদস্য ২৪০৪ জন এবং ২০টি পুরুষ সমিতির সদস্য সংখ্যা ২৬৬ জন। সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ পর্যন্ত সমিতি সদস্যদের মধ্যে ২ কোটি ৫৯ লাখ ৩৮ হাজার ৩৫০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের হার ১০০% ভাগ।

ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পাশাপাশি ঋণের ব্যবহার সম্পর্কেও আশার কর্মীরা ফলো-আপ করেন। আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে ঋণ ব্যবহার না হলে পরবর্তী কিস্তিতে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে ঋণ দেয়া বন্ধ করে দেয়া হয়। এছাড়াও সমিতি সদস্যদের জন্য আশা স্বাক্ষরতা জ্ঞান ও মৌলিক শিক্ষা, উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞান দান করে থাকে। আশা'র সমিতি সদস্যরা প্রতি

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে একটি সভাতে মিলিত হয়ে ঋণের কিস্তি জমা দেয়। আশা'র কমিউনিটি অর্গানাইজার সাপ্তাহিক সভা আয়োজন এবং ঋণের টাকা আদায়ের কাজ করে থাকেন। সমিতি সদস্যদের মধ্যকার বিভিন্ন গ্রুপের মধ্য হতে একজন বা দু'জন সদস্য তার নিজ সমিতির সদস্যদের সংগঠিত করা ও সমন্বয় সাধনের ব্যাপারে আশা'র কর্মীদেরকে সহযোগিতা প্রদান করেন।

কিস্তিভেদে ঋণের পরিমাণ বিভিন্ন অংকের হয়ে থাকে। ঋণ গ্রহীতা সদস্য ১৪% সার্ভিস চার্জ সহ ৪৫ কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করে থাকেন।

এক নজরে আশা- ফুলপাত্তী ইউনিট

সংগঠিত সমিতি	৯২টি
মহিলা সমিতি	৭২টি
পুরুষ সমিতি	২০টি
কর্ম এলাকা ঃ	
থানা	০১টি
ইউনিয়ন	০৫টি
গ্রাম	৩৮টি
পুরুষ সদস্য	২৬৬ জন
মহিলা সদস্য	২৪০৪ জন
প্রদত্ত ঋণ	৳ ২,৫৯,৩৮,৩৫০
আদায়	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

কর্ম-এলাকাধীন ইউনিয়নসমূহ

ফুলগাজী, চিথলিয়া, বজ্রমাহমুদ, পরশুরাম ও আমজাদ হাট ইউনিয়নে আশা'র ফুলগাজী ইউনিট কর্ম- পরিচালনা করছে।

আশা - ফুলগাজী ইউনিটের স্টাফ কাঠামো

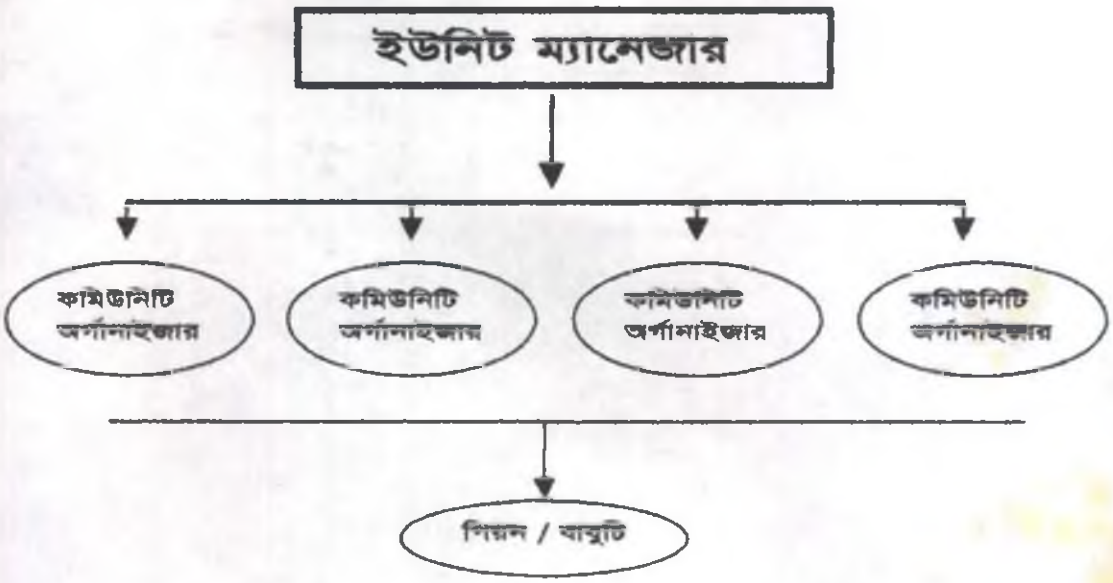

আশা'র কর্মতৎপরতা শুরুর পূর্বে ফুলগাজী এলাকার জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক চিত্র

আশা'র ফুলগাজী ইউনিটের কর্ম-এলাকার আওতাধীন গবেষণার জন্য বাছাইকৃত চারটি গ্রামের আর্থ-সামাজিক তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, আশা'র তৎপরতা শুরুর পূর্বে এই এলাকার আর্থ-সামাজিক জীবনে গতিশীলতা ছিল খুবই কম।

আশা'র সমিতি সদস্য হওয়ার আগে এসব গ্রামের মহিলাদের মধ্যে ১৩ জন অন্যের বাড়ীতে কাজ করতো। বিনিময়ে পেতো তারা তিন বেলা খাওয়া। ঈদের সময় শাড়ী এবং ফসল তোলার সময় কিছু ধান পেতো। বাকী ৬৭ জন মহিলা গৃহস্থালী কাজ ব্যতীত অন্য কোন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সংশ্লিষ্ট ছিল না। আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে তাদের অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধানে দেখা যায়, বর্ষাকালে প্রায় ২ মাস ৩১.২৫% মহিলা কর্মহীন ছিল। এছাড়া কাজের সুযোগ না থাকায় ১২.০৫%, পুঁজির অভাবে ৫০.৭২%, আগ্রহের অভাবে ০৩.৭৫% এবং প্রশিক্ষণের অভাবে ০২.২৩% মহিলা কর্মহীন ছিল। (সারণী -০১)

Dhaka University Institutional Repository

পারিবারিক আয়

আশা'র তৎপরতা শুরু হবার আগে ফুলগাজী এলাকায় জনগণের (পরবর্তীতে যারা আশার সদস্য হয়েছিল) গড় পারিবারিক আয় ছিল অত্যন্ত কম। তাদের এই নিম্ন আয় জীবন-ধারনের নিম্নমান এবং ব্যাপক দারিদ্র্যকেই প্রতিফলিত করে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, ২৬.২৫% পরিবারের গড় মাসিক আয় ছিল ৩০০ টাকা, ৩৮.৭৫% পরিবারের মাসিক আয় ছিল ৩০১-৫০০ টাকা। মাসে ৫০১-৭৫০ টাকা আয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ১৮.৭৫% পরিবার, ৬.২৫% পরিবারের মাসিক আয় ছিল ৭৫১ হতে ৯০০ টাকার মধ্যে। তবে ১০% পরিবারের মাসিক আয় ছিল ৯০১ টাকার উর্ধ্বে। (সারণী ২)

ঋণ প্রাপ্তির উৎস

আশা'র তৎপরতা শুরুর পূর্বেকার অবস্থায় স্বল্প আয় ও বিভিন্ন মেয়াদের বেকারত্বের কারণে ফুলগাজী ও চিথলিয়া ইউনিয়নের দরিদ্র শ্রেণীভূক্ত জনগণ পারিবারিক ব্যয় নির্বাহ করতে ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়তো।

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে,সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ৮০ জন সমিতি সদস্যের মধ্যে ৬৩ জন (৭৮.৭৫%) পারিবারিক ব্যয় নির্বাহ করতে ঋণগ্রস্ত হতো। অবশিষ্ট ১৭ জন অর্থ্যাৎ ২১.২৫% লোক নিজস্ব আয় হতেই পারিবারিক খরচ নির্বাহ করতো। (সারনী ৩-ক)

ফুলগাজী ও চিথলিয়া ইউনিয়নে আশা'র কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ঋণের উৎস সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা জানা যায় যে, শতকরা ২০.৬৩% মহিলা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতেন, ৩৪.৯৩% মহিলা সদস্য ঋণ নিতেন গ্রাম্য মহাজনদের নিকট থেকে। এক্ষেত্রে মহাজনদেরকে চড়া সুদ দিতে হতো। আত্মীয় / প্রতিবেশী থেকে ঋণ গ্রহণ করতো ৪৪.৪৪%। (সারনী ৩-খ)

জীবনধারনের সাধারণ মান

ফুলগাজী এলাকায় আশা'র তৎপরতা শুরুর পূর্বে অধিকাংশ জনসাধারণের জীবনধারনের মান ছিল অত্যন্ত নিম্নপর্যায়ের। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগোষ্ঠী খাদ্য সংস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। জীবনধারণের মান সংক্রান্ত এই তিন সূচকের ভিত্তিতে পরিচালিত জরীপে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় ৭১.২৫% পরিবারের সকল সদস্যের খাদ্য সংস্থান হলেও ২৮.৭৫% পরিবারের সকল সদস্যের প্রয়োজনীয় খাদ্য সংস্থান নিশ্চিত হতো না। শতকরা ৪৬.২৫% পরিবারের চিকিৎসা সুবিধা লাভের সামর্থ্য থাকলেও ৫৩.৭৫% লোক চিকিৎসার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। শতকরা ৭৪.২৫% পরিবারের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাবার সামর্থ্য ছিল, কিন্তু ২৩.৭৫% পরিবারের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠাবার সামর্থ্য ছিল না। (সারণী -৪)

Dhaka University Institutional Repository

ফুলগাজী ইউনিট আশা'র তৎপরতা

ঋণ কর্মসূচী

ফুলগাজী এলাকায় ভূমিহীন ও দরিদ্র জনগণের মধ্যে কাজের সুযোগ সম্প্রসারণ এবং তার ফলে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষে আশা যে সব কার্যকর কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তন্মধ্যে ঋণদান কর্মসূচী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এলাকার দরিদ্র জনগণ বিশেষতঃ ভূমিহীন কৃষক পরিবারের স্ত্রী, মেয়ে যাদের সারা বছরের আয় উপার্জনের সুযোগ সীমিত তাদের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির জন্য ঋণ প্রদানের কর্মসূচীকে এই এলাকায় ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। আশা'র সমিতি সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশই আশা থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে। আশা'র স্থানীয় ইউনিট অফিসকে গ্রাম্য মহিলারা 'আশা ব্যাংক' নামে অভিহিত করেন। এই এলাকায় আশা'র সমিতি সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে ঋণ গ্রহণ করেছে, তবে তাদের সবাই বিভিন্ন উপার্জনমুখী প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে ঋণ নিয়েছে। সাক্ষাতকার প্রদানকারী ৮০ জন সমিতি সদস্যের মধ্যে ৭৬ জন ঋণ গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ ঋণ গ্রহণকারীদের হার ৯৫% ভাগ।

খাতওয়ারী ঋণ গ্রহণের তথ্য থেকে দেখা যায়, ৪০.৭৯% ক্ষুদ্র ব্যবসা, ৩২.৯০% গাড়ী ক্রয় (ঠেলা গাড়ী), ১৫.৭৯% রিক্সা ক্রয়, জমি বন্ধকের জন্য ০৫.২৬%, হাঁস-মুরগী ও মৎস্য চাষের জন্য ০২.৬৪%, মেয়ের বিয়ের জন্য ০১.৩১% এবং অধিক সুদে বিনিয়োগ করেছেন ০১.৩১%। (সারণী - ০৫)

আশা'র মহিলা সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের বিপরীতে গৃহীত ঋণের টাকার পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্যে জানা যায়, ৫৫.২৬% সমিতি সদস্যরা প্রথম কিস্তিতে ২০০০ টাকা ঋণ নিয়েছেন, একই কিস্তিতে যথাক্রমে ৩০০০ ও ৪০০০ টাকা ঋণ নিয়েছেন যথাক্রমে ৩৯.৪৮% এবং ০৭.৯৫%। আবার দ্বিতীয় কিস্তিতে ৩০০০ টাকা ঋণ নিয়েছেন ৩৬.৮৪%, ৪০০০ টাকা ঋণ নিয়েছেন ৪৮.৬৯%, ৬০০০ টাকা নিয়েছেন ০৫.২৭%।

উপরোক্ত তথ্য বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে প্রথম কিস্তিতে ২০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহীতাদের সংখ্যাই (৫৫.২৬%) বেশী। এ থেকে প্রমানিত হয় যে, আশা'র ঋণ প্রদান নীতির সীমাবদ্ধতার কারণে নির্দিষ্ট অংকের টাকার মধ্যে ঋণ প্রদান সীমিত রাখা হয় এবং বড় অংকের ঋণ গ্রহণের সুযোগ রাখা হয় নাই। ফলে সদস্যদের অনেকেই পুঁজির সীমাবদ্ধতার কারণে ক্ষুদ্র পরিসরে বিনিয়োগ করতে বাধ্য হন।

আশা হতে ঋণ গ্রহনের ফলাফল

ঋণের টাকা বিনিয়োগের ফলে সৃষ্ট কর্মসংস্থান

আশা'র মহিলা সদস্যদের মধ্যে ৮০ জন ঋণ গ্রহীতার পরিবারের ১২২ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। ঋণের টাকার সাথে নিজস্ব তহবিল একীভূত করে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের ফলে ঋণ গ্রহীতার পরিবারের ২০ জন সদস্যের পূর্ণকালীন (০১ বছরের বেশী) কর্মসংস্থান হয়েছে। অর্থাৎ এসব লোক বাজারে দোকান দিয়ে,

Dhaka University Institutional Repository

সেলাই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে দীর্ঘমেয়াদী কাজে সম্পৃক্ত হয়েছে। এই ২০ জনের অধিকাংশই ঋণ গ্রহীতা সদস্যার স্বামী।

রিক্সাচালক, ফেরীওয়ালা, কুটির শিল্প, হস্তশিল্প ইত্যাদি কাজে সম্পৃক্ত হয়ে ৬৪ জন (৫৩%) মহিলা ও পুরুষ বছরের অধিকাংশ সময় কাজ করার সুযোগ পেয়েছে। পুরুষদের মধ্যে অধিকাংশ ঋণগ্রহীতা মহিলাদের ছেলে। এছাড়া মৌসুমী ব্যবসা, যেমন-শীতকালে গ্রাম্য দোকান, মুড়ি ভাজা ইত্যাদি মৌসুমী কাজে সম্পৃক্ত হয়েছে ৩৮ জন মহিলা।

ঋণের টাকা বিনিয়োগের ফলে সৃষ্ট মুনাফা ও পারিবারিক আয় বৃদ্ধি

আয় বৃদ্ধির পরিমাণ (মাসিক)	সংখ্যা	%
১০০-২০০ টাকা	১৯ জন	১৫.৫৭%
২০১-৪০০ টাকা	৪৭ জন	৩৮.৫২%
৪০১-৬০০ টাকা	৩৬ জন	২৯.৫০%
৬০১-৮০০ টাকা	১২ জন	০৯.৮৩%
৮০১-১০০০ টাকা	০৮ জন	০৬.৫৫%
মোট	১২২ জন	১০০.০০%

উল্লেখিত তথ্য চিত্রে দেখা যায়, ঋণের টাকা বিনিয়োগের ফলে মাসিক ৮০০-১০০০ টাকা আয় করছেন মাত্র ০৬.৫৫% লোক। ৮০১-১০০০ টাকার মধ্যে আয়ের ফলে ঐ পরিবারের অন্যান্য আয়ের সাথে এই টাকার সংযোজন এসব পরিবারের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়ক হয়েছে। মৌলিক চাহিদা পূরণ করে তারা এখন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন।

৩৮.৫২% লোকের মাসিক বর্ধিত মুনাফা প্রতি মাসে ২০১-৪০০ টাকার মধ্যে সীমিত। মাত্র ০৯.৮৩% লোকের মাসিক বাড়তি আয় ৬০০ হতে ৮০০ টাকার মধ্যে সীমিত। এই তথ্য প্রমান করে যে, ক্ষুদ্র ঋণের বিনিয়োগ বড় অংকের আর্থিক মুনাফার্জনে তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারছে না।

Dhaka University Institutional Repository

আশা'র পৃষ্ঠপোষকতা লাভের পর পেশা ও জীবন ধারণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও অগ্রগতির চিত্র

পেশাগত উন্নয়ন ঃ

আশা'র সমিতি সদস্য হবার পর ক্ষুদ্র ঋণের সুবিধা লাভের মধ্য দিয়ে ফুলগাজী এলাকার জনসাধারণের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যে ভূমিহীন কৃষক অপরের জমি চাষ করতো, সে কিছু জমি বন্ধক নিয়ে, হালের বলদ যোগাড় করে বাড়িয়েছে নিজের উপার্জন। শূন্য গোয়াল ভরে উঠলো গাভী আর গাভীর বাচ্চার পদচারণায়। অপুষ্টির অভাব দূরীভূত হলো বসতবাড়ীতে হাঁস-মুরগী পালনের মাধ্যমে। ডিম, দুধ, মাংশ খাওয়ার সুযোগ এলো নিজেদের উৎস হতে।

পেশাগত পরিবর্তন

পূর্বে	পরে	সংখ্যা	%
গৃহস্থালী	হাঁস/মুরগী পালন	২৪	৩০.০০%
	বেতের কাজ	১৩	১৬.২৫%
	কৃষিকাজে সহযোগিতা	০৮	১০.০০%
চাকরানী	গাভী পালন	১৫	১৮.৭৫%
	সেলাই কাজ	০৬	০৭.০৫%
দৈনিক মজুর	এ্যমব্রয়ডারী কাজ	০২	০২.০৫%
	ক্ষুদ্র ব্যবসা	১২	১৫.০০%

এই তথ্যচিত্র প্রমান করছে যে, মহিলাদের মধ্যে অধিকাংশই গৃহস্থালী কাজ বাদ দিয়ে অন্য কোন পেশায় যুক্ত হয়নি বরং তারা গৃহস্থালী কাজের বাইরে অতিরিক্ত আয় উপার্জনের জন্য বাড়তি কাজ বা পেশায় নিয়োজিত হয়েছেন।

ফুলগাজীতে আশা'র কর্মএলাকায় মেয়াদী সঞ্চয় ও স্বেচ্ছায় সঞ্চয়ের পরিমাণ কম হলেও সমিতি সদস্যরা সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের ব্যাপারে খুব উৎসাহী। তারা সাপ্তাহিক কিস্তির টাকা পরিশোধের দিন সঞ্চয়ের টাকা আশার নিকট জমা রাখে।লক্ষনীয় যে, আশা কর্ম এলাকায় মহিলাদের সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে সফল ভূমিকা পালন করেছে। সমিতি সদস্যরা তাদের অর্জিত আয়ের প্রধান অংশ পারিবারিক ভরণ-পোষণের জন্য ব্যয় করলেও কিছু অর্থ তারা সঞ্চয় করে থাকে বিনিয়োগ ও ভবিষ্যত নিরাপত্তার লক্ষ্যে। মহিলা সদস্যদের ৮৫% তাদের আয় হতে একটি অংশ সঞ্চয় করেছে। তবে সঞ্চয়ের পরিমান খুব বেশী নয়। ৭৬.৫৩% সমিতি সদস্যার সঞ্চয়ের পরিমান অনুর্ধ্ব ১০০০ টাকা। ১০০১-৩০০০ টাকার মধ্যে যাদের সঞ্চয়, তাদের সংখ্যা মোট সদস্য সংখ্যার মাত্র ১১% ভাগ।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঞ্চিত অর্থের বিনিয়োগ

আশা সংগঠিত সমিতিসমূহের সদস্যদের মধ্যে যে ৮৫% ব্যক্তি তাদের উপার্জিত অর্থ থেকে একটি অংশ সঞ্চয় করে থাকে, তাদের মধ্যে অনেকেই কোন না কোন ক্ষেত্রে তাদের সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করেছে। যেমন ঃ-

বিনিয়োগের ক্ষেত্র	সংখ্যা	শতকরা হার
কৃষি জমি	১৬	২০.০০%
ক্ষুদ্র ব্যবসা	১৪	১৭.০৫%
ব্যাংকে সঞ্চয়	০৮	১০.০০%
আশা'য় বিনিয়োগ	২৪	৩০.০০%
ঘর তৈরী ও মেরামত	১২	১৫.০০%
জমি বন্ধক	৬	৭.০৫%

আশার সদস্য হওয়ার পর জমির পরিমাণ পরিবর্তন

আশা'র কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট হবার পর মাত্র ৭.৫% উপকারভোগীর পরিবারের আবাদী জমির পরিমাণ বেড়েছে। জমি বন্ধক নেয়ার কারণেই এই বৃদ্ধি হয়েছে। তবে বাকী ৯৩% সদস্যের জমির পরিমাণ বাড়েনি। এ থেকে এটা প্রমানিত হয় যে, ক্ষুদ্র ঋণ বিনিয়োগের ফলে সৃষ্ট কর্মসংস্থানের কারণে যে আয় হয় তা দিয়ে জমি কেনার সামর্থ্য কারো হয়নি। অর্থাৎ তাদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে তবে ব্যাপক পরিবর্তন নয়।

পারিবারিক সম্পদ বৃদ্ধির চিত্র ঃ

আশা'র পৃষ্ঠপোষকতা লাভের পর সদস্যদের জীবন-যাপনের সাধারণ উপকরণ এবং কয়েকটি উপার্জনকারী উপাদান মিলিয়ে পারিবারিক সম্পদের সংখ্যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেড়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জীবনমান নির্দেশক কতিপয় উপাদান সংযোজিত হয়েছে।

জরীপে দেখা যায় ৮০ জন মহিলা সদস্যের মধ্যে ৫৩ জনের বর্তমানে দু'টো করে ঘর রয়েছে। একটি ঘর নিজেদের থাকার জন্য, অন্য ঘরটি গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী রাখার জন্য।আশা'র সদস্য হবার আগে টিনের ঘর ছিল ৪৭ জনের। বর্তমানে ৬১ জন সদস্যের টিনের ঘর রয়েছে।

সম্পদের প্রকৃতি	পূর্বে ছিল	বর্তমানে আছে	বেড়েছে
টিনের ঘর	৪৭ জনের	৬৫ জনের	১৮টি
২টি ঘর	৩২	৫৩ ,,	২১টি
টিউবওয়েল	৪২	৬৯ ,,	২৭টি

Dhaka University Institutional Repository

জীবনধারণের সাধারণ মান পরিবর্তন

আশা'র পৃষ্ঠপোষকতা লাভের পর নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আশা'র সদস্যদের জীবন-ধারণের মান নির্ধারক কয়েকটি সাধারণ সূচক যেমন - খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও উন্নতির লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। আশা'র পৃষ্ঠপোষকতা লাভের পূর্বে যেখানে ২৮.৯৬% সদস্য পরিবারের সকলের প্রয়োজনীয় খাদ্য সংস্থান করতে পারতো না, সেখানে আশার পৃষ্ঠপোষকতা লাভের পর ৯৪.১১% সদস্যের পরিবারের সকলের প্রয়োজনীয় খাদ্য সংস্থান নিশ্চিত হয়েছে অর্থাৎ ৩০.৫৯% সদস্য, যাদের পরিবারের সকলের প্রয়োজনীয় খাদ্য সংস্থান পূর্বে হতো না কিন্তু বর্তমানে তাদের খাদ্য সংস্থান হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা যায়, আশা'র পৃষ্ঠপোষকতা লাভের পূর্বে যেখানে ৭৪.২৫% সদস্য তাদের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠাবার সামর্থ্য রাখতেন, সেখানে আশা'র পৃষ্ঠপোষকতা লাভের পর ১০০% সদস্য তাদের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠাবার সামর্থ্য লাভ করেছেন। এক্ষেত্রে ২৫.৭৫% সদস্যের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এ থেকে লক্ষনীয় যে, আশা'র সহযোগিতার ফলে গ্রামীণ জনসাধারণ তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সক্ষম হয়েছে।

নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে সমিতি সদস্যদের ধারণা

জরীপে অংশগ্রহণকারী ৮০ জন সমিতি সদস্য কেউ তাদের আর্থিক অবস্থাকে পূর্বের চেয়ে খারাপ মনে করেন না। ১০০% উত্তরদাতাই স্বীকার করেন যে, আশা'র সদস্য হবার কারণে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। ৯৪% উত্তরদাতা নিজেদেরকে দরিদ্র বলে মনে করেন না।

নমুনা বিশ্লেষণ-০২

মৌলিক চাহিদা কর্মসূচী (মৌচাক)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মৌলিক চাহিদা কর্মসূচী (মৌচাক) একটি স্থানীয় এনজিও। এই এনজিওটি গবেষণার অপর একটি নমুনা। প্রথমে এই সংগঠনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখ করা হলো।

মৌচাক - এর দর্শন

মৌচাক বিশ্বাস করে, সারা দুনিয়ায় খেটে খাওয়া লড়াকু মানুষদের মত বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষকেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে সুসংগঠিত লড়াই পরিচালনা করতে হবে। আর এ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে নারী-পুরুষের সমান অধিকার, সম মর্যাদা এবং সে সাথে পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে সুনিশ্চিত।

খেটে খাওয়া মানুষের মুক্তির সংগ্রামে স্বাধীন সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহযোগী ভূমিকায় অবতীর্ন 'মৌচাক'। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৌমাছির সমবেত ভূমিকায় যেমন গড়ে উঠে

Dhaka University Institutional Repository

একটি মৌচাক, তেমনি কোটি কোটি মানুষের পুঞ্জিভূত শক্তি একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

সারা পৃথিবীর মুক্ত চিন্তার মানুষদের মত মৌচাকের বদ্ধমূল বিশ্বাস যে, নারীর অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তন না করলে এবং অর্ধেক নারী শক্তিকে জাতীয় উন্নয়ন ও মুক্তির লড়াইয়ে সহযোগী করতে না পারলে ইপ্সিত সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হবে না।

মৌচাক তার সংগঠনের ভিশন সুনির্দিষ্ট করেছে খেটে খাওয়া মানুষের স্বশাসন (স্ব-রাজ) প্রতিষ্ঠা এবং সকল পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর সুনিশ্চিত ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

মিশন (Mission)

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিজস্ব স্বাধীন সংগঠন গড়ে তুলে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে ঋণ সহায়তা দানের মাধ্যমে তাদের স্বনির্ভর করা ও সম্পদের সুষম বন্টন এবং খেটে খাওয়া মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করাই হচ্ছে মৌচাকের মিশন।

কর্মকৌশল

মৌচাকের সকল কর্মকান্ড পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে গ্রামে গ্রামে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগঠন বা সমিতি গড়ে তোলা।

অন্যদিকে উৎপাদনমূলক কাজে 'প্রবেশ নিষেধ' এর দেয়াল ডিঙিয়ে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে প্রধানতঃ নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সমিতিতে সংগঠিত করে এই সংগঠন।

নারী উন্নয়ন বিষয়সহ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সাধারণ সমস্যা মোকাবিলায় সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টির পক্ষে কাজ করে মৌচাক। সমিতির সদস্যদের আয়োজিত সালিশ, সমাবেশ, মহাসমাবেশ, প্রতিবাদ সভা ও মিছিল কেবল সমাজপতি নয়,রাষ্ট্র পরিচালকদের ওপরও চাপ সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

সচেতনতা শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে ঋণ সহযোগিতা প্রদান করে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীকে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য স্বনির্ভর করে তোলা মৌচাকের অন্যতম প্রধান কর্মকৌশল।

নারীর অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তনের লক্ষে সচেতনতা শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নেতৃত্ব বিকাশের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। সঠিক নেতা চিহ্নিতকরণ ও নেতৃত্বের বিকাশ সাধনই বৃহত্তর আন্দোলনের প্রধান পুঁজি। এ বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতেই রয়েছে মৌচাক পরিচালিত ক্রমাগত নেতৃত্বের বিকাশ ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী।

স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও সামাজিক দায়িত্বসমূহ সম্পাদনের মাধ্যমে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতি অখন্ড প্রতিশ্রুতি সৃষ্টি করা মৌচাকের সামাজিক আন্দোলনের আর একটি কৌশল।

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে মৌচাক

কর্মএলাকা

জেলার সংখ্যা	৪ টি (মানিকগঞ্জ, শটুয়াখালী, নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ
থানা	৯ টি
ইউনিয়ন	৪৫ টি
গ্রাম	১৯৪ টি
পরিবার	১৩,৫৬৮ টি
সংগঠিত সমিতি	১৬৩৮ (মহিলা সদস্য ১৪৫২ জন, পুরুষ সদস্য ১৮৬)
সমিতি সদস্য	১৪,৯০১ জন (পুরুষ ১৬৬৮, মহিলা ১৩২৩৩)
ব্রাঞ্চ অফিস	১০ টি
জোনাল অফিস	০৩ টি
কর্মী সংখ্যা	৬১ (মহিলা ২৭, পুরুষ ৩৪)
সমিতি সদস্যদের সঞ্চয়	৪৫,৫৭,৪২০ টাকা
ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল	৬৬,০০,০০০ টাকা
ঋণ বিতরণ	২,৮২,২২,২৮১ টাকা
ঋণ আদায়ের হার	৯৮%

কর্মসূচীসমূহ

১) সমিতি সংগঠিত করা
২) উন্নয়ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ
৩) স্বাক্ষরতা কার্যক্রম
৪) ঋণ বিতরণ ও সঞ্চয়
৫) লিঙ্গ সমতা উন্নয়ন
৬) পরিবেশ উন্নয়ন
৭) দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা
৮) প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা
৯) পরিবার পরিকল্পনা
১০) আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা এলাকা নরসিংদী সদর থানার পরিসংখ্যান

আয়তন	-	২১৮ বর্গ কিলোমিটার
জনসংখ্যা	-	৪,৫১,৩৩৫ জন
পুরুষ	-	২,৩৭,৪৫২ জন
মহিলা	-	২,১৩,৮৮৩ জন
ইউনিয়ন	-	১৪টি
গ্রাম	-	২৬৪টি

উৎস ঃ থানা পরিসংখ্যান অফিস, নরসিংদী সদর।

নরসিংদী সদর থানায় মৌচাকের কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য

কর্মএলাকা (ইউনিয়ন)	-	৭টি
গ্রাম	-	৩৩টি
সংগঠিত সমিতি	-	১০৭টি
উপকারভোগী মহিলা	-	৩০৩১ জন
উপকারভোগী পুরুষ	-	৫৪০ জন
সংগঠিত পুরুষ সমিতি	-	২০ টি
সংগঠিত মহিলা সমিতি	-	৮৭ টি
বিতরণকৃত ঋণ	-	৫১,৫৪,৮০০ টাকা।

নরসিংদী এলাকায় দারিদ্র্য পরিস্থিতি ও মৌচাকের উন্নয়ন কার্যক্রম

নরসিংদী এলাকায় মৌচাক কাজ করে আসছে ১৯৯২ সাল থেকে। শুরু থেকেই ভাড়া বাড়ীতে অফিসের কাজ করা হচ্ছে।

কাউরিয়াপাড়া, সাটিরপাড়া ও বিলাসদী - এই তিনটি গ্রামে ১৫টি সমিতি রয়েছে। প্রতি সমিতিতে ২০-২৫ জন সদস্য রয়েছে। মূলতঃ এলাকায় ভূমিহীন, কর্মজীবী, দিনমজুর, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ইত্যাদি নিম্নবিত্ত শ্রেণীর লোক যাদের সারা বছরের ভরণপোষণের নিশ্চয়তা নেই, তারাই মৌচাকের Target Benificiary। এই শ্রেণীর লোকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষে মৌচাকের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

Dhaka University Institutional Repository

নরসিংদী এলাকায় সংগঠিত সমিতি সদস্যদেরকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা, নির্দিষ্ট প্রকল্পে ঋণদান করা, ব্যবহারিক শিক্ষা, ছেলে-মেয়ের লেখাপড়া ইত্যাদি বিভিন্নক্ষেত্রে মৌচাক অত্র এলাকায় কাজ করছে। প্রথম কিস্তিতে সাধারণত ১০০০ হতে ২০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেয়া হয়ে থাকে ও দ্বিতীয় কিস্তিতে ঋণের টাকা আরো বাড়তে থাকে।

মৌচাকের সদস্যরা প্রতি সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে একটি সভাতে মিলিত হয়ে সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি জমা দেয়। মৌচাকের এরিয়া অফিস থেকে আগত মাঠ কর্মীগণ সাপ্তাহিক সভা আয়োজন ও ঋণের টাকা আদায়ের কাজ করে থাকেন।

নরসিংদী সদর থানার ৭টি ইউনিয়নের ৩৩টি গ্রামে সমিতি সদস্যদের মাঝে মোট ৫১,৫৪,৮০০ টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

মৌচাকের উপকারভোগীদেরকে ঋণ প্রদানের পাশাপাশি তাদের নেতৃত্বের যোগ্যতা বৃদ্ধি, সচেতনতা বাড়ানো ও উন্নয়ন-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে জ্ঞান দেয়া হয়।

নরসিংদী এলাকায় মৌচাকের নিম্নোক্ত কর্মসূচী রয়েছে ঃ

* সংগঠন তৈরী
* উন্নয়ন শিক্ষা কর্মসূচী
* সঞ্চয় কর্মসূচী
* আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী
* আইন শিক্ষা ও আইন সহায়তা কর্মসূচী
* প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

এরিয়া অফিসে জনবল

এরিয়া ম্যানেজার	-	০১ জন
জুনিয়র অফিসার	-	০১ জন
মাঠকর্মী	-	০৫ জন
পিয়ন	-	০১ জন
		০৮ জন

মৌচাকের তৎপরতা শুরুর পূর্বে নরসিংদী এলাকায় জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্র ঃ

সামাজিক অবস্থা ঃ নরসিংদীর গ্রামীণ এলাকায় মৌচাকের কাজ শুরুর পূর্বে এখানকার সামাজিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। পুরুষ-প্রধান পরিবার ব্যবস্থায় নারীরা গৃহকোনে বন্দী ছিল। গৃহস্থালী কাজ ছাড়া আনুষ্ঠানিক খাতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ ছিল নগন্য। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মাঠ সহকারী এবং কয়েকটি এনজিও-এর মাঠকর্মী পদে স্বল্প সংখ্যক মহিলা কাজ করতো এই এলাকায়।

Dhaka University Institutional Repository

শতকরা ৯০ ভাগ পুরুষ কৃষিতে নিয়োজিত ছিলো। কৃষিতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা ৬৫ জন প্রকৃত অর্থে ভূমিহীন (যাদের জমির পরিমাণ ১.৫ একরের কম)। গ্রামের পুরুষ ব্যক্তিদের মধ্যে ২৮% দিন মজুর, ৭.১৩% ব্যবসা এবং ২.৮০% লোক রিকশা / অটো রিকশা চালনায় জড়িত ছিল। গ্রামীণ মহিলাদের ৯৩.৬৬% গৃহস্থালী কাজের সাথে যুক্ত ছিলো।

পারিবারিক আয়

মৌচাকে'র তৎপরতা শুরু হওয়ার পূর্বে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গবেষণা এলাকার জনগণের (যারা পরবর্তীতে মৌচাকের সদস্যপদ লাভ করে মৌচাকের সহযোগিতা পেয়েছে) গড় পারিবারিক আয় ছিল অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের। তাদের এই নিম্ন পর্যায়ের পারিবারিক আয় জীবন-ধারনের নিম্নমান এবং ব্যাপক দারিদ্র্যকেই প্রতিফলিত করে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, ২১.১৭% পরিবারের গড় পারিবারিক আয় মাত্র ৬৫০ টাকা অর্থাৎ বছরে মাত্র ৭৮০০ টাকা। বছরে ২৫০০০.০০ টাকা গড় আয় সম্পন্ন পরিবারের সংখ্যা মাত্র ২.১৬%।

পারিবারিক ঋণগ্রস্থতা

মৌচাকের তৎপরতা শুরু হওয়ার পূর্বে আর্থিক অভাবগ্রস্থতার কারণে এ এলাকার গ্রামীণ জনগণ ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়তো। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, পারিবারিক ব্যয় নির্বাহ করতে ৬৫.৭৬% ঋণগ্রস্থ হতো। তবে শতকরা ২৮.১৪ ভাগ লোক নিজস্ব আয় হতেই পারিবারিক খরচ নির্বাহ করতো।

মৌচাকের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বে ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিরা বিভিন্ন উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করতেন। জরীপে প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ১১% লোক বিভিন্ন ব্যাংক হতে, ৭৪% লোক মহাজনের কাছ থেকে এবং ১৫% লোক আত্মীয় ও প্রতিবেশীর কাজ থেকে ঋণ গ্রহণ করতেন।

মহাজনদের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণের সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে জমি বন্ধক দিতে হতো। ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে যারা প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করতেন তাদেরকে সুদ দিতে হতো না। ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণকারীদের নির্দিষ্ট হারে সুদসহ ঋণ পরিশোধ করতে হতো। মহাজন থেকে ঋণ নেয়ার একটি অপ্রীতিকর পরিণতি ছিলো নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় অনেককেই পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি মহাজনকে উইল করে দিতে হয়েছে।

জীবনযাত্রার মান

নরসিংদী জেলার গ্রাম এলাকায় মৌচাক-এর কাজ শুরুর পূর্বে অধিকাংশ মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করার মতো অবস্থা ছিল না। মৌলিক চাহিদার অন্তর্ভূক্ত খাদ্য, শিক্ষা ও চিকিৎসা এই তিনটি সূচকের ভিত্তিতে পরিচালিত জরীপে প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, ৩১.৪৮% পরিবারের সকল সদস্যের প্রয়োজনীয় খাদ্য সংস্থান নিশ্চিত হতো না। শতকরা ২৯.১৪ ভাগ পরিবারের সকল সদস্যের চিকিৎসার সুবিধা নিশ্চিত করা সম্ভব ছিল না এবং ৩৭% পরিবারের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠাবার সামর্থ্য ছিল

Dhaka University Institutional Repository

না। এসব তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, জীবন ধারণের সাধারণ মান নির্ধারক উপাদান যেমন খাদ্য, চিকিৎসা ও শিক্ষার সুযোগ হতে প্রায় এক তৃতীয়াংশ পরিবার বঞ্চিত ছিলো।

নরসিংদী এলাকায় মৌচাকের তৎপরতা ঃ আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টায় মৌচাক কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচীর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী। মৌচাক মনে করে গরীব জনগোষ্ঠীকে মূলধন দিয়ে সহযোগিতা করলে তারা এই টাকা আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ করে নিজেদের অভাব দূরীকরণে সফল হবে। তাই মৌচাক স্বল্প সুদে নরসিংদী কর্মএলাকায় সমিতি সদস্য / সদস্যাদেরকে ঋণ দিয়ে আসছে। মৌচাকের মাঠকর্মীরা সমিতির সাপ্তাহিক সভায় ঋণের সঠিক ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেন এবং কিস্তিতে ঋণের টাকা আদায়ের দায়িত্ব পালন করেন।

এলাকার দরিদ্র জনসাধারণ, যাদের সারা বছরের কর্মসংস্থান নেই এবং আয়-উপার্জনের সুযোগ সীমিত তাদের কর্মসংস্থান ও আয়-উপার্জনের জন্য নতুন প্রকল্প গ্রহণ এবং এসব প্রকল্পে অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নত করতে মৌচাকের ঋণদান কর্মসূচী ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে।

ঋণের ব্যবহার

গবেষণা এলাকা হতে সংগৃহীত উপাত্ত থেকে জানা যায় মৌচাক হতে ঋণগ্রহনকারীরা নিম্নোক্ত কাজে তাদের নেয়া ঋণকে মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ করেছেন -

ক্ষুদ্র ব্যবসা	-	৫৯%
সেলাই মেশিন ক্রয়	-	২১%
গাভী পালন	-	০৭%
রিক্শা ক্রয়	-	০৬%
টিউবওয়েল বসানো	-	০২%
ঘরবাড়ী তৈরী	-	০৩%
জমি ক্রয়	-	০২%

		১০০%

উল্লিখিত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে অনেকেই ক্ষুদ্র ব্যবসায় টাকা বিনিয়োগ করেছেন এবং মহিলা সদস্যরা সমিতি থেকে টাকা নিয়ে তাদের স্বামীদেরকে পুঁজি দিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসায় সহযোগিতা করেছেন।

রিকশা ক্রয়ের ক্ষেত্রে দু'ধরনের বিনিয়োগ লক্ষ্য করা যায়। কোন ক্ষেত্রে দরিদ্র সমিতি সদস্য ঋণের টাকা দিয়ে রিকশা কিনে সে রিকশা চালিয়ে সেখান থেকে প্রাপ্ত আয় দিয়ে ঋণের টাকা শোধ করছেন। এক পর্যায়ে ঋণের টাকা শোধ হওয়ার পর সে রিকশার মালিক হয়েছে। অন্যদিকে দেখা যায় মৌচাক থেকে ঋণ নিয়ে রিকশা কিনে সেই রিকশা দৈনিক ভাড়ার ভিত্তিতে একজন রিকশাচালকের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে

Dhaka University Institutional Repository

সহায়তা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আয় থেকে দায় শোধের মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতা এক পর্যায়ে রিকশার মালিক হয়ে যাচ্ছেন। তবে, কিছু ক্ষেত্রে ঋণের টাকা বিনিয়োগ না হয়ে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের তথা ভোগের জন্য ব্যয় হয়েছে।

একটা বিষয় খুব স্পষ্ট যে, ঋণের টাকার পরিমাণ কম হওয়াতে ঋণ গ্রহীতারা দীর্ঘ মেয়াদী ও বড় আকারের কোন প্রকল্প গ্রহণ করতে পারেন না।

প্রশিক্ষণ প্রদান এবং এর ফলে উপার্জনের সুযোগ

নরসিংদীর গ্রামীণ এলাকার জনগণ যারা কাজের যথাযথ দক্ষতা বা প্রশিক্ষণের অভাবে নিজস্ব উদ্যোগে কাজের সুযোগ লাভ করতে পারেনি তাদের কিছু অংশ মৌচাকের সংগঠিত দলের সদস্য হয়ে মৌচাক থেকে প্রশিক্ষণ পেয়ে কাজের ফলে উপার্জনে সক্ষম হয়েছে। বিশেষতঃ মহিলা সমিতি সদস্যরা নিয়মিত প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের অধিকাংশ (৭১.৮৫%) প্রশিক্ষণের ফলে উপার্জনের সুযোগ লাভ করেছে।

মৌচাক সমিতি সদস্যদেরকে উৎপাদনমূলক এবং সেবামূলক উভয় ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষিত করে তুলেছে। তবে জটিল প্রযুক্তি নির্ভর বা সুদক্ষতা ভিত্তিক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ না দিয়ে বরং সাধারণ দক্ষতা উন্নয়নের মধ্যেই প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সীমিত রয়েছে।

সাধারণভাবে মৌচাকের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে অল্প পরিমান পুঁজি ও সীমিত পর্যায়ের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে গ্রামীণ জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনের মধ্যে। এছাড়া গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের সম্পুরক এবং উপার্জনের সুযোগ সাপেক্ষে কিছু কিছু ক্ষেত্রেও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

মৌচাকের সমিতি সদস্যগণ যে সব বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করেছে সেগুলো হচ্ছে হাঁস মুরগী পালন, বাড়ীর আংগিনায় শাকসব্জী চাষ, খামার ব্যবস্থাপনা, পোকা-মাকড় দমন, ডায়রিয়া প্রতিরোধ, পরিবারে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, শিশুদের টিকাদান, নার্সারী, বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম, প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম, ধাত্রী সেবা, দর্জির কাজ এবং এ্যামব্রয়ডারীর কাজ।

মৌচাকের এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী অর্থাৎ প্রশিক্ষণ গ্রহীতাদের মধ্যে অধিকাংশই অশিক্ষিত। প্রশিক্ষণের ফলে যাদের উপার্জনের সুযোগ হয়েছে তাদের আয়ের পরিমাণ খুব সামান্য। তবে দারিদ্র্য জর্জরিত জীবনে এই সামান্য আয় তাদের আপেক্ষিক পারিবারিক উন্নতিতে সহায়ক হয়েছে। মাসিক আয়ের তথ্যে দেখা যায়, শতকরা ৪২.১৪ ভাগের মাসিক আয়ের পরিমান ২৫০ টাকা, শতকরা ২৫.৭১ ভাগের ৪০০ টাকা, শতকরা ৪.৫৭ ভাগের ৫০০ টাকা, শতকরা ৩.৫৭ ভাগের ৬০০ টাকা এবং শতকরা ২.৫৭ ভাগের ৬০০ টাকার উর্ধ্বে। বর্ণিত তথ্যে এটা স্পষ্ট যে, মাসিক ৪০০ টাকার বেশী মাসিক আয় করতে পারে এমন লোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মৌচাকের প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ব্যাপক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি হয়নি, বরং অবস্থায় আংশিক উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মৌচাকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের পর পেশা ও জীবনধারণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও অগ্রগতির চিত্র নিম্নরূপ ঃ

মৌচাক-সংগঠিত সমিতি সদস্য হবার পর সদস্যদের জীবনধারণের মান নির্ধারক কয়েকটি সাধারণ সূচক যেমন খাদ্য, চিকিৎসা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও উন্নতির লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। মৌচাকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের পূর্বে যেখানে ৩১.৪৮% পরিবারের সকল সদস্যের প্রয়োজনীয় খাদ্য সংস্থান নিশ্চিত হতো না, মৌচাকের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হওয়ায় এই হার ২০% এ নেমে আসে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে দেখা যায়, পূর্বে যেখানে ৭০.৮৬% পরিবারের সকল সদস্যের চিকিৎসা সুযোগ নিশ্চিত ছিল, বর্তমানে তা বেড়ে ৭৪% এ উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে ৮৪% পরিবার তাদের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠায়, পূর্বে এই হার ছিল ৬৩%।

মৌচাকের সদস্য হওয়ার পর পারিবারিক সম্পদ বৃদ্ধির চিত্র

মৌচাকের উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে সদস্যদের জমি কেনার সামর্থ্য গড়ে না উঠলেও জীবনযাপনের সাধারণ উপকরণ এবং পারিবারিক সম্পদের পরিমাণ বেড়েছে। জরীপে দেখা যায় ৭৪% লোকের পূর্বে বসতবাড়ী ছিলো কিন্তু মৌচাকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের পর তা বর্তমানে ৯৬% ভাগে উন্নীত হয়েছে।

২৬% লোক যারা ছনের ঘরের মধ্যে বসবাস করতো পরবর্তীতে তাদের মধ্য হতে ১৯% লোক টিনের ঘর বাধতে সক্ষম হয়। সমিতি সদস্যাদের মধ্যে মাত্র ২% এর ঘরে নিজস্ব সেলাই মেশিন ছিল। কিন্তু মৌচাক থেকে ঋণ নিয়ে বর্তমানে ১৩% মহিলা সদস্য সেলাই মেশিনের মালিক হয়েছেন। উল্লেখ্য, এসব মেশিন চালিয়ে তারা অব্যাহত আয়ের সুযোগ পেয়েছে। রিক্সার মালিকের হার পূর্বের ৫% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৯% এ উন্নীত হয়েছে।

আবাদী জমি ও কৃষিকাজে অগ্রগতি

কয়েকটি ক্ষেত্রে মৌচাক থেকে ঋণ নিয়ে মহিলা সদস্যরা এই টাকা স্বামীকে দিয়েছেন, স্বামী ঋণের টাকার সাথে নিজস্ব মূলধন যোগ করে জমি বন্ধক নিয়ে চাষবাস করেছেন। কৃষিকাজের ফলে অর্জিত বাড়তি আয় থেকে ঋণের টাকা শোধ করা হয়েছে। মাত্র ৩% উপকারভোগীর ক্ষেত্রে এ ধরনের অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়।

আবার অন্য রকম চিত্রও রয়েছে। কৃষি জমিতে আধুনিক চাষাবাদ যেমন - ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করা, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ক্রয়ে বিনিয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ঋণের টাকা ব্যবহৃত হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা মহিলা তার স্বামীর সাথে উন্নয়ন অংশীদারের ভূমিকা পালন করেছে।

গড় মাসিক আয় বৃদ্ধি

মৌচাকের সমিতির সদস্য হওয়ার পর সদস্যদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হবার কারণে গড় মাসিক আয় বেড়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মাসিক আয় বৃদ্ধির একটি সংখ্যাগত চিত্র নীচে উপস্থাপন করা হলো ঃ

মাসিক গড় আয় বৃদ্ধি	% ব্যক্তি
টাকা ১০০ - ২০০	২২%
টাকা ২০১ - ৩০০	৩০%
টাকা ৩০১ - ৪০০	২৮%
টাকা ৪০১ - ৫০০	১৩%
টাকা ৫০১ - তদুর্ধ	৭%

বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঞ্চিত অর্থের বিনিয়োগ

মৌচাকের নিয়মানুযায়ী ঋণ গ্রহীতাদের বাধ্যতামূলক সঞ্চয় করতে হয়। এছাড়া উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হবার ফলে তাদের অর্জিত বাড়তি আয়ের কিছু অংশও তারা সঞ্চয় করে থাকেন। সমিতির সাপ্তাহিক সভাগুলোতে সমিতি সদস্যদেরকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সমিতি সদস্যরা সঞ্চিত অর্থ ক্ষুদ্র ব্যবসা, ঘর তৈরী ও মেরামত, জমি বন্ধক নেয়া, টিউবওয়েল বসানো, মহাজনী ব্যবসা ও ব্যাংকে আমানত হিসেবে রেখে থাকেন।

পেশাগত পরিবর্তন

মৌচাকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের কারণে উপকারভোগীদের পেশাগত পরিবর্তন বেশ লক্ষনীয়। মৌচাক প্রদত্ত ঋণ ও প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে এবং সমিতি বৈঠকে সচেতনায়ন কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমিতি সদস্যরা তাদের পেশাগত পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।

যে সব মহিলা অপরের বাড়ীতে শুধু খাবারের বিনিময়ে সারাদিন কাজ করতেন, তারা এখন নিজের ঘরে বসে কাজ করে এবং স্বামী ছেলে মেয়ে নিয়ে এক সাথে খেতে পারেন। চাকরানীর পেশা পরিবর্তন করে মুরগী পালনে যুক্ত হয়েছে ১৩.৪%, নার্সারীতে ০৫%, ক্ষুদ্র ব্যবসায় ১২%, সেলাই কাজে ১৬%, এ্যমব্রয়ডারী ও বাটিকের কাজে ১৮% এবং সবজি চাষে ০২% মহিলা সম্পৃক্ত হয়েছেন। তবে মহিলারা অন্য পেশায় আসার কারণে তারা গৃহস্থালীর কাজ একেবারে বাদ দেয়নি বরং গৃহস্থালী কাজের বাইরে অতিরিক্ত আয় উপার্জনের বাড়তি কাজ বা পেশায় নিয়োজিত রয়েছে।

নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে মৌচাক সদস্যদের ধারণা ঃ

মৌচাকের সদস্যদের মধ্যে কেউ তাদের আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ বলে মনে করেন না। মাত্র ০৮% উপকারভোগী তাদের অবস্থা আগের মতো রয়েছে মনে

Dhaka University Institutional Repository

করেন। বাকী ৯২% উপকারভোগী মনে করেন এনজিও কর্মকান্ডের কারণে তাদের জীবনে গতিশীলতা এসেছে, তারা স্বাবলম্বী হতে পেরেছে, তাদের বাড়তি উপার্জন তাদের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে সহায়ক হয়েছে। তবে তারা তাদের এই উন্নতিকে ব্যাপক না বলে তুলনামূলক উন্নতি বলে অভিহিত করেছেন।

দারিদ্র্য বিমোচনে আশা ও মৌচাকের সীমাবদ্ধতা ও সাফল্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

আশার উন্নয়ন কর্মকান্ড মূলত ঋণকেন্দ্রিক, যা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় সফলভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কিন্তু এই ঋণ প্রবাহ জনজীবনে ব্যাপক উন্নয়নের ছাপ ফেলতে পারেনি। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ঋণের টাকা বিনিয়োগের ফলে মাসিক ৮০০-১০০০ টাকা আয় করছেন মাত্র ০৬.৫৫% লোক। প্রতি সপ্তাহে কিস্তি পরিশোধের কারণে ঋণ গ্রহীতা ঋণের টাকা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ করতে পারছে না।

জীবনধারণের সাধারণ মান পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, আশা'র উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হবার পরও ৬% সমিতি সদস্যের পরিবারের সকলের খাদ্য সংস্থান নিশ্চিত হচ্ছে না। আবার ৯৪% উত্তরদাতা নিজেদেরকে দরিদ্র মনে না করলেও ৬% উত্তরদাতা নিজেদের দরিদ্র মনে করেন। ঋণগ্রহীতা সকল সদস্য সঠিকভাবে ঋণের ব্যবহার করেননি।

দারিদ্র্য ঘুচাতে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান উন্নয়ন সহযোগিতার একটি একক মাত্র, এটি কখনো পূর্ণ সহযোগিতা নয়। গবেষণা এলাকায় মৌচাকের সমিতি সদস্যরা ঋণ সুবিধা ব্যতীত অন্যান্য সহায়তা তেমন পাননি। বিশেষতঃ প্রশিক্ষণ সুবিধা বলতে মৌচাকের কর্মএলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও শাক-সবজী উৎপাদন প্রশিক্ষণের মধ্যে সীমিত ছিল। মৌচাকের কর্মএলাকায় মাত্র ২.৫৭% পরিবারের গড় মাসিক আয় ৬৫০ টাকা, যা কিছুতেই দারিদ্রসীমা উন্নয়নের পরিচায়ক নয়।

মৌচাকের কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হবার কারণে ৪৮% লোকের খাদ্য সংস্থানের সংখ্যাগত পরিমাণ বাড়লেও এখনও ১১.৪৮% পরিবারের খাদ্য সংস্থানের নিশ্চয়তা নেই। আবার প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্যে ২৮.১৬% প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কোন উন্নয়নমূলক কাজে লাগায়নি। এক্ষেত্রে মৌচাকও কোন রকম ফলো-আপ করেনি। এছাড়া প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের জ্ঞানও সাধারণ দক্ষতার মধ্যে সীমিত। ফলে তাদের জীবনযাত্রায় ব্যাপক মানোন্নয়নে সক্ষম হয়নি। ৮% উপকারভোগী তাদের অবস্থা পূর্বের মতো রয়েছে বলে জানিয়েছেন।মৌচাকের কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হবার পর ৮০% পরিবারের সকল সদস্যের প্রয়োজনীয় খাদ্যসংস্থান নিশ্চিত হলেও বাকী ২০% পরিবারের প্রয়োজনীয় খাদ্য সংস্থান হয়নি।

তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় চিকিৎসা সুবিধা প্রাপ্তদের সংখ্যা ৮৪% হয়েছে এটা যেমন সত্য, তেমনিভাবে এটাও সত্য যে বাকী ১৬% উপকারভোগী চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম মাপকাঠী হচ্ছে- আয় বৃদ্ধি। অথচ মৌচাকের গবেষণা এলাকায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, গড় মাসিক আয় ৫০০ টাকার উর্দ্ধে এমন

Dhaka University Institutional Repository

লোকের সংখ্যা মাত্র ৯% এবং অধিকাংশ লোকের গড় মাসিক আয় ৩০০- ৪০০ টাকার মধ্যে সীমিত।

সুতরাং প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে এটি স্পষ্ট যে, দারিদ্র্য বিমোচনে মৌচাকের উপকারভোগীরা কিছুটা সফল হলেও তারা পুরোপুরিভাবে দারিদ্র্যের শিকল ভাঙতে পারেনি। ৯২% উপকারভোগী মনে করেন এনজিও কর্মকান্ডের কারণে তাদের জীবনে গতিশীলতা এসেছে, তারা স্বাবলম্বী হবার সুযোগ পেয়েছে। তাদের বাড়তি উপার্জন জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়ক হয়েছে, তবে তাদের এই উন্নতিকে তারা ব্যাপক না বলে তুলনামূলক উন্নতি বলে অভিহিত করেছেন।কিছু সুস্পষ্ট নির্দেশক বা বৈশিষ্ট্যও দারিদ্র্য বিমোচন প্রক্রিয়াকে স্পষ্ট করে তোলে।

দারিদ্র্য সংশ্লিষ্ট সূচকগুলোর ইতিবাচক পরিবর্তন দারিদ্র্য বিমোচন নির্দেশ করে। যেমন মাসিক গড় আয় বৃদ্ধি, খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি, সম্পদের মালিকানা অর্জন, পেশাগত মর্যাদা বৃদ্ধি, শিক্ষায় বর্ধিত সুযোগ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধি, নারী - পুরুষ বৈষম্যের অবসান ইত্যাদি।

দারিদ্র্য বিমোচন প্রক্রিয়ায় কর্মরত বেসরকারী সংগঠন 'আশা' ও 'মৌচাক'-এর কর্মএলাকায় দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টার প্রাপ্তি এক নয়। 'আশা' ক্ষুদ্র ঋণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধার ক্ষেত্রে যতটুকু সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে, 'মৌচাক' ততটুকু করতে পারেনি। তবে মৌচাক সীমিত পরিসরে সমিতি গঠন করে দলীয় চেতনা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণকে সর্বদা উদ্বুদ্ধ করে স্বাবলম্বী হতে সহযোগিতা করেছে। মৌচাকের ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ও আদায় প্রক্রিয়ায় উপকারভোগীরা সন্তুষ্ট হলেও মৌচাক তাদের জন্য অন্যান্য প্রাসংগিক সুযোগ- সুবিধা নিশ্চিত করতে পারেনি।

মৌচাক ও আশা'র কর্ম এলাকায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের তুলনামূলক তথ্য :

উন্নয়ন সূচক	আশা	মৌচাক
কৃষি জমি বৃদ্ধি	৭.৫%	.০৩%
খাদ্য সংস্থান	৯৪.১১%	৮০%
প্রাথমিক শিক্ষা সুবিধা	১০০.০০%	৮৪%
চিকিৎসা সুবিধা	৮৪%	৭৪%

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

উন্নয়নশীল বিশ্বে দারিদ্র্য বিমোচন একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। এটা সত্য যে, বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনে সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও কাজের সুযোগহীনতার কারণে দারিদ্র্য পরিস্থিতি ব্যাপকভাবে ঘনীভূত হয়েছে। সরকারী উন্নয়ন প্রচেষ্টায় কিছুটা অগ্রগতি হলেও তৃণমূল পর্যায়ের মানুষ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র অতিক্রম করতে পারেনি। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় আধুনিকায়ন প্রচেষ্টার ফলে গ্রাম থেকে অসংখ্য মানুষ শহরে অভিবাসন হয়ে নগর দারিদ্র্যকে ঘনীভূত করেছে। এই প্রেক্ষাপটে বেসরকারী সাহায্য সংস্থার দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে একটি নতুন সংযোজন।

দারিদ্র্য নিয়সনের লক্ষ্যে এনজিওসমূহের ঋণ কার্যক্রম অনেক ক্ষেত্রেই ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ মুহম্মদ ইউনুছ প্রায়ই বলেন, "ঋণ পাওয়া মানুষের অধিকার"। এই অধিকার পূরণে বাংলাদেশের এনজিওগুলো বিশ্বব্যাপী প্রশংসা কুড়িয়েছে।

ভূমিহীন ও দরিদ্র চাষীর পরিবার-যারা অন্যের জমি চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করতো, যাদের মৌসুমী কৃষি কাজের বাইরে অন্য কোন কাজের বিকল্প সুযোগ ছিল না তারা 'আশা' ও 'মৌচাকে'র সহায়তা কাজে লাগিয়ে পণ্য উৎপাদন এবং ব্যবসা ও সেবামূলক তৎপরতার সাথে যুক্ত হয়ে আয় বাড়াতে সক্ষম হয়েছে।

গ্রামের যে মহিলাটি অপরের বাসায় কাজের 'বুয়া' ছিল এনজিও কার্যক্রমের ফলে আজ সে নিজের ঘরে কাজ করে স্বাবলম্বী হয়েছে। যে সব মহিলা জীবনের দীর্ঘ সময় অপরের ছেলেকে স্কুলে নেয়ার কাজ করতো, আজ সে নিজ সন্তানকে স্কুলে পাঠাচ্ছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনে এই পরিবর্তন হঠাৎ করে আসেনি। এনজিওদের উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম, তৃণমূল পর্যায়ে কর্মীদের অবস্থান, পারস্পরিক বিশ্বাস, সর্বোপরি নিজের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য আগ্রহ, চেষ্টা ও শ্রমের ফলেই এই অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

দারিদ্র্য দূরীকরণ জটিল ও দুরূহ ব্যাপার। তা সত্ত্বেও এই দুর্লভ কাজে সফলতা অর্জন অসম্ভব কিছু নয়। স্বাধীনতাত্তোরকালে প্রতিটি সরকারই দারিদ্র্য দূরীকরণের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। এছাড়াও বাংলাদেশ পৃথিবীর সর্বাধিক এনজিও'র আবাসস্থল। এসব এনজিওগুলো ইতোমধ্যেই দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থিত ৫১% জনগণকে নানা প্রকার সেবা ও সহযোগিতা দিচ্ছে।

বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত "বিশ্ব মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন" এ বলা হয়েছে, "উন্নয়নশীল দেশগুলোর মানুষ এখন মোটামুটিভাবে আগের চেয়ে কম দরিদ্র। তাদের ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালো এবং তারা এখন অধিক হারে শিক্ষা পাচ্ছে। পরিবেশের প্রতি বিগত বছরগুলোর অবহেলা এসব দেশ এখন কাটিয়ে উঠেছে।" এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ে স্বল্প পরিসরে হলেও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে।

বাংলাদেশে এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণের যোগানদাতা সরকারী প্রতিষ্ঠান পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSP)এর মহাপরিচালক সালাহ উদ্দীন আহম্মদ বলেছেন-

Dhaka University Institutional Repository

"আমি মনে করি ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী থেকে এনজিওদের সংগঠিত সমিতি-সদস্য আর্থিকভাবে যতোটা না লাভবান হয়েছে তার চেয়ে বেশী অর্জন হয়েছে সামাজিকভাবে। গ্রামের মহিলাদেরকে সাপ্তাহিক সভায় আসতে হয়, দল গঠন করতে হয়, নেতা নির্বাচন করতে হয়। এর ফলে একটা সামাজিক সচেতনতা তৈরী হয়েছে। ১৯৯৭ সালের ইউপি নির্বাচনে গ্রাম পর্যায়ের মহিলাদের সর্বাত্মক অংশগ্রহণ থেকে গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়নে বিষয়টি আমাদের কাছে ধরা দেয়। এখন নতুন যে কোন উন্নয়ন কর্মকান্ডে মহিলাদেরকে অংশগ্রহণ করানো সম্ভব যেটা পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ থেকে আপেক্ষিকভাবে অনেক ভালো বলেই আমার মনে হয়।"[১৯]

'আশা' ও 'মৌচাক' অন্যান্য এনজিও'র মতো সামাজিক সেবামূলক এবং উৎপাদনমূলক কাজের মাধ্যমে গ্রামীণ জীবনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হলেও বিনিয়োগধর্মী প্রকল্পগুলোর সাফল্যের মাত্রা খুব বেশী নয়। কেননা, সীমিত অর্থের বিনিয়োগ ভোগের চাহিদা পূরনের পর উদ্বৃত্ত পুঁজি আকারে খুব বেশী পরিমাণে পুন:বিনিয়োজিত হতে পারেনি। সামগ্রিক বিবেচনায় উৎপাদন ক্ষেত্রে বা মুনাফা সৃষ্টির ক্ষেত্রে আশা ও মৌচাকের প্রচেষ্টার পরিসর অত্যন্ত সীমিত বলে অর্জিত আয় বা মুনাফা গ্রামীণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উজ্জীবন সাধনের মাধ্যমে সাধারণভাবে জীবনধারণের গুণগত ও পরিমাণগত ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। অধিকন্তু, আশা বা মৌচাকের কার্যক্রমের ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সচেতন, সংগঠিত এবং তাদের প্রচেষ্টাকে উজ্জীবিত করে গ্রামীণ পরিসরে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং এর ফলে আয় বৃদ্ধি করে দারিদ্র্য পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি সাধন করতে পারলেও গ্রামীণ সামাজিক স্তর বিন্যাসের পরিবর্তন এবং গ্রামীণ এলিটের ক্ষমতাগত ভিত্তির বিকল্প শক্তি হিসেবে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। তবে এ প্রক্রিয়া কিছুটা এগিয়েছে। সমিতি সদস্যরা ইউপি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে।

উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন অর্থাৎ উৎপাদন উপকরণের মালিকানার পরিবর্তন না ঘটিয়ে বিদ্যমান উৎপাদন সম্পর্ক টিকিয়ে রেখে গ্রামীণ অর্থনৈতিক জীবনে অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীলতা রক্ষার প্রচেষ্টার মধ্যেই আশা ও মৌচাকের সামগ্রিক তৎপরতা আবর্তিত। অর্থাৎ এনজিওদের কার্যক্রম গ্রামীণ দরিদ্র জনগণকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখা এবং বিদ্যমান আর্থিক অবস্থার আপেক্ষিক উন্নতি বিধানের মাধ্যমে ব্যাপক দারিদ্র্যকে কমিয়ে আনার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে, বাংলাদেশের দারিদ্র্যের মাত্রা এতোই ব্যাপক যে একক ভাবে সরকার বা এনজিও কারো পক্ষে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব নয়। সরকারের পক্ষে যেমন তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করার সমস্যা রয়েছে, তেমনি আঞ্চলিক বা জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ কিছু কাজ করে সারাদেশে দারিদ্র্য দূর করা এনজিওদের পক্ষে একা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সরকার ও এনজিও'র সমন্বিত কর্মসূচী প্রয়োজন। এনজিওরা সরকারের বিকল্প কোন কাঠামো নয় বরং পরিপূরক ভূমিকা পালন করতে পারে।

এ ছাড়া দারিদ্র্য দূরীকরণে ব্যক্তিখাতকেও এগিয়ে আসতে হবে। জনকল্যাণ মূলক মানসিকতা নিয়ে ব্যক্তিখাতের প্রভাবশালীদের এগিয়ে আসতে হবে। সঠিক বিচারে

---

[১৯] দৈনিক ভোরের কাগজ, ঢাকা, ২৩ অক্টোবর ১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

বলা যায়, এনজিও কর্মএলাকায় দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টা কিছু অংশে সফলতা অর্জন করেছে। বিশ্বব্যাংকের একটি স্টাডি রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, গ্রামীণ ব্যাংকের ২৪ লাখ উপকারভোগীর মধ্যে এক তৃতীয়াংশ দারিদ্র্য সীমা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংকের মতো 'আশা' বা 'মৌচাক'ও তাদের কর্মএলাকায় ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর মাধ্যমে একজন বিত্তহীন ভূমিহীনকে সম্পদে প্রথম প্রবেশাধিকার দিয়েছে। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙতে ক্ষুদ্র ঋণ প্রাথমিক সাহস যুগিয়েছে। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, আইনগত সহায়তা ও নারীর ক্ষমতায়ন সামগ্রিক উন্নয়ন প্রয়াসকে ত্বরান্বিত করেছে। ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে এনজিওদের সফলতা অনস্বীকার্য।

১৯৯৫ সালে পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় –

"দেশের তৃণমূল পর্যায়ে এনজিওদের কর্মকান্ড দিন দিন বাড়ছে এবং অংশ গ্রহণমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশের দরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি দেশে কর্মরত এনজিওসমূহ ১৫% অবদান রাখছে।"

"মৌচাক" এবং "আশা" উল্লেখিত কাজগুলোর সাথে সম্পৃক্ত করেছে তৃণমূল পর্যায়ের জনগণকে। বিশেষতঃ এসব কাজে নারীর অংশগ্রহণ উৎসাহব্যঞ্জক।

১৯৯১ সালে অস্থায়ী সরকার গঠিত টাস্কফোর্স রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, "দারিদ্র্য সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত। সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ছাড়া এ ক্ষেত্রে কোন লক্ষ্য নির্ধারণ সম্ভব নয়।"

দারিদ্র্য নিরসনে এনজিও কতটুকু সফল? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, এনজিও'রা কিছুটা সফল হয়েছে। এনজিও কর্মকান্ড দেশের মোট জনসংখ্যার তুলনায় খুবই অল্পসংখ্যক জনগোষ্ঠীকে ঘিরে আবর্তিত। গ্রামীণ দারিদ্র্য নিরসনের ফলে দেশের সার্বিক দারিদ্র্য পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অভিজ্ঞ জনগোষ্ঠীর স্থানান্তর, এনজিও বিরোধী প্রচারণা, এনজিও কর্মকান্ডে সুষ্ঠু সমন্বয়ের অভাব, বড় এনজিওদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবর্তে গ্রুপিং, এনজিওদের সমন্বয় সংস্থা এডাবের তীব্র রাজনীতিমুখীতা ইত্যাদি কারণে দারিদ্র্য বিমোচনে এনজিও'দের কমিটমেন্ট তারা নিজেরাই রক্ষা করতে পারছে না।

গ্রামের সমিতি বৈঠকে নারীর ক্ষমতায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সম-অংশগ্রহণের কথা বলা হলেও এনজিও'দের নিজেদের প্রশাসনিক কাঠামো তথা সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের মাত্রা উল্লেখযোগ্য নয়। তাই এনজিওদের কথা ও কাজের মধ্যে বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়।

অধিকাংশ এনজিও দেশের আলেম, ওলামা তথা ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিতদের 'মৌলবাদী' ও 'ফতোয়াবাজ' বিশেষণে আখ্যায়িত করায় তৃণমূল পর্যায়ে নেতৃস্থানীয় ধর্মীয় নেতাদের সাথে এনজিও'দের দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ তীব্রতর হচ্ছে।

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পরিচালিত উন্নয়ন কর্মকান্ডে সকল শ্রেণীর নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। প্রকৃতপক্ষে পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকান্ডে কেউ প্রতিপক্ষ থাকতে পারেনা।

Dhaka University Institutional Repository

গত ২৫/০৬/৯৮ ঢাকায় বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও ভোরের কাগজ আয়োজিত "বাংলাদেশ থেকে কিভাবে দ্রুত দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব?" শীর্ষক সংলাপে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহিউদ্দীন খান আলমগীর বলেন, "আমাদের দেশে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য এখনও রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সচেতনতা আসেনি। যতদিন এদিক থেকে অনুকূল সমর্থন পাওয়া যাবে না, ততদিন পর্যন্ত দারিদ্র্য বিমোচন হবে না।" তিনি বলেন, "দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়টি ডান দলগুলো যথাযথ এড়িয়ে গেছে, অন্যদিকে বামদলগুলো থেকেও প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায়নি[২০]।"

একই সংলাপে অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, "দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সরকারের সক্ষমতা বাড়াতে হবে, এজন্য যে ৪টি বিষয়ে নজর দিতে হবে তা হলো- সম্পদ বন্টন কৌশল, ক্ষুদ্রঋণ, বাজার ও রাজনীতি। এগুলোর সঠিক সমন্বয়ের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্যোগ নিতে হবে।"

দরিদ্র মানুষ চিরকাল দরিদ্র থাকবে এটা কোনদিন কাম্য হতে পারে না। সমাজ ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাতে মেধা এবং পরিশ্রমের জোরে দরিদ্র লোক তার দারিদ্র্য সীমা ভেদ করে উপরে উঠে আসতে পারে। এটা পরীক্ষিত সত্য যে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কাজে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে তার সক্ষমতার বিকাশ সাধনের মাধ্যমেই দারিদ্র্য নিয়ন্ত্রন সম্ভব। একই সাথে উৎপাদন উপকরণগুলোর মালিকানাও দরিদ্র জনগণের হতে হবে।

উপসংহারে বলা যেতে পারে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টায় এনজিও কর্মকান্ড ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। দেশের ব্যাপক দারিদ্র্যের তুলনায় এনজিও কর্মকান্ড সীমিত হলেও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতায় বিকাশ ও উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পৃক্তকরণের জন্য এনজিও কার্যক্রম নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার।

বিআইডিএস সূত্রে জানা যায় ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৪ সালে পল্লী দারিদ্র্য ৫৭.৫% থেকে হ্রাস পেয়ে ৫১.৭% হয়েছে। চরম দারিদ্র্য হ্রাস পেয়ে ২৫.৮% থেকে ২২.৫% হয়েছে। দারিদ্র্যসীমা ও দারিদ্র্যের ব্যবধান ২১.৭% থেকে ১৯.২%-এ এসেছে।

এনজিওদের কর্মকান্ডের কারণে স্বাস্থ্য,শিক্ষা,পরিবেশ ও অন্যান্য উন্নয়ন-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতার প্রেক্ষিতে সামগ্রিকভাবে ইতিবাচক ফলাফল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেমন- ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের বিবাহিত মহিলাদের ৪% জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি গ্রহণ করতো, ১৯৭৫ সালে এই হার বেড়ে ৮% এ দাঁড়ায়। বর্তমানে তা বেড়ে ৪৯% হয়েছে। এর পাশাপাশি শিশু মৃত্যুর হারও উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। Bangladesh Demography and Health Survey 1996-97 থেকে দেখা যায়, ৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার ১৯৮২-৮৬ সময়কালে যেখানে প্রতিহাজারে জীবিত জন্মের ক্ষেত্রে ১৭৩ ছিল ১৯৯৬ সালে তা কমে ১১৬ তে এসে দাঁড়িয়েছে।

কল্যাণধর্মী অর্থনীতির প্রবর্তক নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক অমর্ত্য সেন এবং মানব উন্নয়ন সূচকের প্রবর্তক মাহবুবুল হক অর্থনীতির অগ্রগতির সাথে মানব সম্পদ

[২০] ভোরের কাগজ, ঢাকা, ২৬ জুন,১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নের ব্যাপারটির এক নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। এনজিও'দের উন্নয়ন কর্মকান্ডে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ সীমিত পরিসরে হলেও মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করছে।

অমর্ত্য সেনের মতে, বাজার অর্থনীতিতে একজন দরিদ্র মানুষের অবস্থান নির্ভর করে সম্পদের উপর তার অধিকার কতটুকু সংরক্ষিত হচ্ছে তার ওপর। আমাদের দেশের অর্থনীতি মূলতঃ প্রকৃতি-নির্ভর। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিশাল এ দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিজেদেরকে বারবার একই জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। আবহমান বাংলার চলমান এ গতিশীল বৈশিষ্ট্যের জন্য গ্রামের আর্থ-সামাজিক পরিবেশে জীবন সংগ্রামে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের এরা খাপ খাওয়াতে সক্ষম হয়েছে।

চরম দারিদ্র্যই এ জনগোষ্ঠীকে পারস্পরিক আদান প্রদানে নির্ভরশীল করে গড়ে তোলে এক প্রকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী। সহমর্মীতা, সহযোগীতা ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে এরা বিভিন্ন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে গোষ্ঠীর সদস্যদেরক রক্ষা করার চেষ্টা করে। অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের ভাষায়- "সমন্বিত জন উদ্যোগ ও জন-ক্রিয়া যা দরিদ্র মানুষের অবস্থানকে সুসংহত করে এবং যা পরিচালিত হয় জনগণের জন্য, জনগণ দ্বারা[২১]। দারিদ্র্য পরিস্থিতির উন্নতিকল্পে এরূপ গ্রামীণ জন উদ্যোগকে বিকাশ উপযোগী করতে "আশা" ও "মৌচাক" এর কার্যক্রম সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

দারিদ্র্য বিমোচনের সংগ্রাম একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু নীতিমালা এবং সার্বিক উন্নয়ন কৌশল। দারিদ্র্য নিরসনের জন্য উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধি অর্জনই একমাত্র উৎস নয়। অর্জিত প্রবৃদ্ধির সুষম বন্টন ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনিয়ম বিশৃংখলা ও অদক্ষতার সংস্কার করে সম্পদের অপব্যবহার রোধ করে অতিরিক্ত সম্পদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা প্রয়োজন। গ্রামীণ সমাজ-কাঠামোর অনাবশ্যক বিধি-নিষেধের অবলুপ্তি ঘটিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃত চালিকাশক্তি জনশক্তিকে মানব সম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে আশা ও মৌচাকের সাফল্য প্রয়োজনের তুলনায় খুব বেশী নয়, তবে সীমিত পরিসরে হলেও আলোচ্য এনজিও দুটোর সাফল্য লক্ষণীয়।

"আশা" ও "মৌচাক"-এর কার্যক্রম পর্যালোচনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, উভয় সংস্থাই তাদের উন্নয়ন কর্মকান্ডে সবচেয়ে গুরুত্ব দিচ্ছে ঋণদানের ওপর। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে - শুধু ঋণদান কার্যক্রম দরিদ্র জনগণের সমস্ত চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম নয়। এজন্য প্রয়োজন একটি সার্বিক ও সমন্বিত প্রচেষ্টা, যেখানে মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলো পূরণ করার ন্যূনতম সুযোগ থাকবে। ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের ওপর প্রথম আর্ন্তজাতিক সম্মেলনে IFAD এর প্রেসিডেন্ট তার বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন-

"যারা দরিদ্রদের নিয়ে কাজ করেন তাদের অভিজ্ঞতা হলো ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম দরিদ্রতা দূর করার অনেকগুলো প্রয়োজনীয় উপকরণের একটি মাত্র। অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণও সচেতনভাবে সমন্বিত করা প্রয়োজন।"

---

[২১] অর্মত্য সেন ও জেমস ডি উলফেনসন, "উন্নয়ন ঃ মুদ্রার দুই পিঠ" প্রথম আলো, ঢাকা, ২২ জুন ১৯৯৯

Dhaka University Institutional Repository

'দারিদ্র্য' একদিকে আপেক্ষিক অন্যদিকে বহুমাত্রিক। তাই দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে শক্তি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সরকার ও এনজিও প্রচেষ্টা ইতোমধ্যে কিছু সফলতা নিয়ে এসেছে। গত ০৬ এপ্রিল '৯৯ ঢাকায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো আয়োজিত 'দারিদ্র্য পরিবীক্ষণ' সম্পর্কিত এক জাতীয় সেমিনারে উল্লেখ করা হয় যে, শহর এলাকায় দরিদ্রদের পরিবার পিছু মাসিক আয় পূর্ব বছরের এপ্রিল মাসের ২৮৪৭ টাকা থেকে ১৯৯৮ সালের একই মাসে ৩৪২৩ টাকায় উন্নীত হয়। জরীপ অনুযায়ী, শহরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গড় মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ এর এপ্রিলে ৬৩৭ টাকায় পৌঁছায়। ১৯৯৭ এর এপ্রিল-এর পরিমান ছিল ৫৩৯ টাকা। গ্রামীণ দরিদ্রদের ক্ষেত্রে গড় মাথাপিছু আয় একই সময়ে ৪০২.২০ টাকা থেকে ৪৩৬.২০ টাকায় বৃদ্ধি পায়। জরীপে বলা হয় শহরে দরিদ্রদের মাথাপিছু ক্যালরী গ্রহন ১৯৯৮ সালের এপ্রিল মাসের হিসাবানুযায়ী বৃদ্ধি পেয়ে গড়ে ১৯৫৮.৮৯ কিলোক্যালরীতে দাড়িয়েছে। ১৯৯৭ সালের এপ্রিলে এর পরিমান ছিল মাথাপিছু ১৯২৫.০০ কিলো-ক্যালরী। এ প্রসংগে গত ১৬ অক্টোবর '৯৯ The Daily Star পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের অংশবিশেষ উল্লেখযোগ্য-

"The poverty alleviation programme have came out with a remarkable success with gradual decline in the percentage of poor in Bangladesh. The recent BBS surveys said the percentage of poor in rural areas declined from 49.7% in April,1996 to 47.6% in April,1998 and in urban areas from 44.4% to 44.3% during the same period.

The per capita calorie intake has also increased in recent years with 1885 kilo calorie in December,1995 to 1,953 kilo calorie in April,1998 in rural areas and 1895 kilo calorie to 1,959 kilo calorie in urban areas during the same period"[22].

সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টায় অগ্রগতি হচ্ছে। কোন ক্ষেত্রে এনজিওরা সরকারের সহযোগী হিসেবে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনায় এনজিওদের অনুসৃত মডেল অনুসরন করা হচ্ছে।

আশা ও মৌচাকের কর্মএলাকায় সাফল্যের তুলনামূলক পর্যালোচনা প্রমান করে যে, দারিদ্র্য মোচনের লক্ষে মৌচাকের চেয়ে আশা'র সাফল্যের মাত্রা বেশী। আবার মৌচাক ও আশা'র কর্মএলাকায় স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের যে চিত্র-তা দেশের অন্য এলাকায় (যেখানে এনজিও কাজ করছে না) চেয়ে অনেকাংশে উন্নত।

নমুনা বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, এনজিও কর্মএলাকায় সীমিত আকারে দারিদ্র্য বিমোচন হচ্ছে। এনজিও কার্যক্রমে সরকারী সহযোগিতায় পাশাপাশি জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হলে এনজিও কার্যক্রমে আরো অধিক জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যাবে যার ফলশ্রুতিতে দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টা আরো অধিক সফলতা নিয়ে আসবে।

---

[22] The Daily Star, ঢাকা, ১৬ অক্টোবর, ১৯৯৯

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

সারণী-০১

আশা'র উপকারভোগী হওয়ার পূর্বে ফুলগাজী এলাকার

মহিলা সদস্যদের কর্মহীনতার চিত্র

	কর্মহীনতার কারণ	সংখ্যা	%
১	বর্ষাকাল	২৫	৩১.২৫
২	কাজের সুযোগের অভাব	১০	১২.০৫
৩	পুজির অভাব	৪০	৫০.৭২
৪	আগ্রহের অভাব	০৩	০৩.৭৫
৫	প্রশিক্ষণের অভাব	০২	০২.২৩
		৮০ জন	১০০.০০

সারণী- ০২

আশা'র সমিতি সদস্য হওয়ার পূর্বে ফুলগাজী এলাকার আশার সদস্যদের গড় পারিবারিক আয়

আয় বিভাজন

মাস	বছর	সংখ্যা	%
০-৩০০	০-৩৬০০	২১	২৬.২৫
৩০১-৫০০	৩৬০১-৬০০০	৩১	৩৮.৭৫
৫০১-৭৫০	৬০০১-১০০০	১৫	১৮.৭৫
৭৫১-৯০০	১০০১-১৫০০০	০৫	৬.২৫
৯০১-তদুর্ধ	১৫০০১-তদুর্ধ	০৮	১০.০০
		৮০	১০০.০০

Dhaka University Institutional Repository

সারণী- ০৩-ক

ঋণগ্রস্থতার চিত্র	সংখ্যা	শতকরা
ঋণগ্রস্থ হতো	৬৩	৭৮.৭৫
ঋণগ্রস্থ হতো না	১৭	২১.২৫
মোট	৮০ জন	১০০.০০

সারণী- ০৩-খ

ঋণের উৎস	সংখ্যা	শতকরা
ব্যাংক	১৩	২০.৬৩
মহাজন	২২	৩৪.৯৩
আত্মীয়/ প্রতিবেশী	২৮	৪৪.৪৪
	৬৩	১০০.০০

সারণী- ০৪

আশা'র সদস্য হওয়ার পূর্বে জীবনধারনের মান নির্ধারক কয়েকটি সূচক

খাদ্য সংস্থান	সংখ্যা (জন)	%	চিকিৎসার সুযোগ	সংখ্যা	%	শিক্ষার সুযোগ	সংখ্যা	%
পরিবারের সকল সদস্যের প্রয়োজনীয় খাদ্য সংস্থান হতো	৫৭	৭১.২৫	পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা নিশ্চিত করা সম্ভব ছিল	৩৭	৪৬.২৫	ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠাবার সামর্থ ছিল	৬১	৭৪.২৫
খাদ্য সংস্থান হতো না	২৩	২৮.৭৫	সম্ভব ছিল না	৪৩	৫৩.৭৫		১৯	২৩.২৫
	৮০			৮০			১০০	

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-০৫ ক

আশার মহিলা সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ গ্রহনের অবস্থানঃ

প্রকল্প	ঋণগ্রহনকারীর সংখ্যা	%
ক্ষুদ্র ব্যবসা	৩১ জন	৪০.৭৯
গাভীক্রয়	২৫	৩২.৯০
রিকশা ক্রয়	১২	১৫.৭৯
জমি বন্ধক	০৪	০৫.২৬
পোলট্রি	০২	০২.৬৪
মেয়ের বিয়ে	০১	০১.৩১
অধিক সুদে বিনিয়োগ	০১	০১.৩১
	৭৬	১০০.০০

সারণী ৫-খ

কিস্তি	টাকার পরিমান	ঋণ গ্রহনকারীর সংখ্যা	%
১ম	২০০০	৪২	৫৫.২৬
	৩০০০	৩০	৩৯.৪৮
	৪০০০	০৬	০৭.৯৫

কিস্তি	টাকার পরিমান	ঋণ গ্রহনকারীর সংখ্যা	%
২য়	৩০০০	২৮	৩৬.৪৮
	৪০০০	৩৭	৪৮.৬৯
	৫০০০	০৭	০৯.২১
	৬০০০	০৪	০৫.২৭

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থ/প্রবন্ধ

১) আনু মুহাম্মদ, বাংলাদেশের উন্নয়ন কি অসম্ভব? জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫,

২) আনু মুহাম্মদ, বাংলাদেশের উন্নয়ণ সংকট ও এনজিও মডেল, প্রচিন্তা প্রকাশণী, ঢাকা, ১৯৮৭

৩) ডঃ মাহবুব-উল-হক, উন্নয়ন অন্বেষণ, পালক পাবলিশার্স, ঢাকা,১৯৯৫

৪) এজাজুল হক চৌধুরী, স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন ও বাংলাদেশ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

৫) মোঃ এনামুল হক, দারিদ্র বিমোচন ও তৃণমূল উন্নয়ন, আশা, ঢাকা,

৬) রুশিদান ইসলাম রহমান, দারিদ্র্য ও উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, বি আই ডি এস, ঢাকা ,

৭) হারুন অর রশিদ, বাংলাদেশে এনজিও, প্রগতি প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৬

৮) হামিদুল হক, স্বদেশে চিঠি, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৯৩,

৯) মুহম্মদ সামাদ, বাংলাদেশে গ্রামীন দারিদ্র্য বিমোচনে এনজিও'র ভূমিকা, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা,১৯৮৪

১০) বিশ্বব্যাংক, বিশ্ব উন্নয়ন সূচক প্রতিবেদন ১৯৯৮,

১১) জাতিসংঘ সংবাদ, ইউ এন আই সি, ঢাকা, জানুয়ারী-১৯৯৬

১২) ASA- Sustainavie Micro Finance Model. ASA, July 1996,

১৩) M S Alam Mia, Poverty Alleviation in Bangladesh-An Exploration. BUP.1993

১৪) দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মশালা প্রতিবেদন, সংবাদ, ঢাকা, ২৩ জুন ১৯৯৮

১৫) মাহবুব-উল-করিম,"দারিদ্র্য বিমোচণে স্বেসরকারী উদ্যোগ", ভোরের কাগজ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫

১৬) শাহীন রহমান, "দারিদ্র্য বিমোচনঃ বাস্তবতা ও সম্ভাবনা", উন্নয়ন পদক্ষেপ অক্টোবর - ডিসেম্বর ১৯৯৭

১৭) ঝর্ণা ধর, "এনজিওদের আসল চেহারা ঃ ভারতীয় অভিজ্ঞতার আলোকে" পালাবদল, ঢাকা, আগস্ট ১৯৯৭

১৮) মোকাম্মেল হোসেন ও পলাশ বাগচী, বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচণে এনজিও'র কার্যক্রম ও বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রসংগ, উন্নয়ন বিতর্ক, বিইউপি,ঢাকা, ১৯৯৬

১৯) ডক্টর কাজী খলিকুজ্জামান, "দারিদ্র্য মোচন উন্নয়নের লক্ষ্য","দৈনিক ইনকিলাব," ঢাকা, ০৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩

২০) পিকেএস এফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডক্টর সালাহ উদ্দীন এর সাক্ষাৎকার ভোরের কাগজ, ঢাকা, ২৩ অক্টোবর, ১৯৯৮

২১) গ্রামীণ ব্যাংক প্রধান প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুছ এর সাক্ষাৎকার, দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯৮

82770
Dhaka University Institutional Repository

২২) Mr. Idriss Jazairy, Poverty Alleviation And Sustainable Growth, The Bangladesh Observer, Dhaka, ২৩ ডিসেম্বর ১৯৯৮

২৩) Mr. Akter Hossain, Poverty Alleviation in Bangladesh, Asian Affairs, Volume 18, January-March 1996

২৪) Dr. Nazmul Ahsan Kalimullah, Behavioural and Political Aspects of NGOs in Indian Rural Development, 1997, Dhaka University

২৫) মোঃ সুলতানুজ্জামান, "দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে উন্নয়ন কৌশল" দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ জানুয়ারী ১৯৯৯

২৬) ডঃ টমাস কস্তা, "স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো কি দরিদ্রজনদের কাছে পৌঁছাতে ব্যর্থ হচ্ছে?" দৈনিক সংবাদ, ৫ জানুয়ারী ১৯৯৮

২৭) সৈয়দ সামসুজ্জামান নীপু, "অর্থনীতির আলোকে মানব সম্পদ উন্নয়ন" দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯

২৮) গাউসুর রহমান, "দারিদ্র্য বিমোচন কোন পথে?" দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ এপ্রিল ১৯৯৯

২৯) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, দারিদ্র্য পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন, ১৯৯৮

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার